মৌলানা
আবুল কালাম আজাদ

আবুল কালাম আজাদ

শ্রীঋষি দাস

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

ডাঃ গোবিন্দচন্দ্র ভৌমিক
এম. বি., (ভূতপূর্ব আইন-সভার সদস্য)
ছোট মামাকে—

ঋষি

এই পুস্তকের ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, এই পুস্তকখানিই ভূমিকা মাত্র।

১লা পৌষ, ১৩৫৪

লেখক

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

এক

হিন্দুরা লক্ষ্মীর নাম দিয়েছিলেন চঞ্চলা। কারণটা সম্ভবত এই যে একই মানুষের জীবনে অনেক সময় এঁর যাতায়াত ঘটে নিতান্ত আকস্মিক রূপে, অপ্রত্যাশিত ভাবে। বিদ্যার দেবীটি অবশ্য এমন চঞ্চলমতি নন। কোনো ব্যক্তির জীবনে যখন তাঁর আবির্ভাব একবার ঘটে, তখন সে ব্যক্তিকে সমস্ত জীবন-ই তিনি তাঁর প্রসন্নতা দিয়ে যান। কিন্তু অপর পক্ষে, কখনো কখনো পুরুষানুক্রমে যদি বা চঞ্চলার স্থিতিটা হয় অচঞ্চল, পিতৃপুরুষের অর্জিত লক্ষ্মীর প্রসাদ চক্রবৃদ্ধিহারে বর্ধিত হ'তে থাকে পুরুষানুক্রমে,—বিদ্যাদায়িনীর কার্পণ্যটা কিন্তু ওদিকে থাকে অবর্ণনীয়। তাঁর প্রসাদের জন্যে প্রতি পুরুষেই প্রতি ব্যক্তির চাই সাধ্য-সাধনা, স্তুতি-তোষণ, তপশ্চর্যা। এদিক থেকে মা সরস্বতীই সত্যিকারের চঞ্চলা। তাঁর মানসিক গঠন-ভংগীটা উত্তরাধিকার-প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধী—তাঁকে পেতে হয় ব্যক্তিগতভাবে, বংশগতভাবে নয়। তাই দেখা গেছে পুরুষানুক্রমে প্রায়ই দেবী সরস্বতীর স্থিতি হয় না সংসারে।

কিন্তু তাঁর চঞ্চল দাক্ষিণ্যটা একদা সুদীর্ঘ কাল অচঞ্চল ছিল বা এখনো আছে আমাদের পরিচিত একটি সংসারে। এই সংসারের বর্তমান শ্রেষ্ঠ পুরুষ—আমাদের কাহিনীর নায়ক মওলানা আবুল কালাম আজাদ। দেবী সরস্বতীর মতন এ-সংসারে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে দীর্ঘ কাল বাঁধা আছেন দেবী লক্ষ্মী-ও। বাস্তবিক, এমনটি কদাচিৎ দেখা যায়।

কয়েক শতাব্দী আগের কথা। সম্রাট আকবর তখন দিল্লীর সিংহাসনে। হিন্দু-মুসলমানকে একই জাতীয়তার বন্ধনে দৃঢ়সংবদ্ধ করতে পণ করেছেন তিনি এবং তাঁর অমাত্যেরা। তাঁরা বুঝেছেন, হিন্দু-মুসলমানের বিচ্ছেদ ও বৈরিতার চোরাবালির ওপর ভিত্তি ক'রে কোনো প্রকার রাজনীতিক, অর্থ-নীতিক বা সমাজনীতিক প্রাসাদ গ'ড়ে তোলা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা কেবল মাত্র ধর্মনীতিক সহিষ্ণুতা বা স্ব স্ব ধর্মের বা ধর্মাচরণের সুযোগ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তাঁরা দিয়েছিলেন এই দুই জাতিকে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সমান অধিকার, এমন কি পারস্পরিক বৈবাহিকতার সুযোগ সুবিধা। এই ব্যাপারে মানসিংহ যেমন হিন্দুদের পক্ষ থেকে সম্রাট আকবরকে সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন, (এবং হিন্দু ঐতিহাসিকদের হাত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন অক্ষয় কলংক) তেমনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে এগিয়ে এসে-ছিলেন সুধী রাজনীতিক ও মহাপণ্ডিত আবুল ফজল। সম্রাট আকবরকে পরধর্ম সম্পর্কে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিয়েছিলেন আবুল ফজলের পিতা মোল্লা মোবারক। মোল্লা মোবারকের মধ্যে পরধর্মবিদ্বেষ বিন্দুমাত্র ছিল না ব'লে তাঁকে গোঁড়া দরবেশদের হাতে কম লাঞ্ছনা পেতে হয় নি। আবুল ফজলের সাহচর্যে ও সহযোগিতায় পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে নির্লিপ্ত অনুসন্ধান এবং সহনশীল আলোচনার জন্যে সম্রাট আকবর একটি প্রতিষ্ঠান

গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ফলে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি ইবাদতখানা বা উপাসনা-মন্দির—যেখানে সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতরা স্ব স্ব ধর্ম সম্পর্কে আলোচনার জন্যে একত্রিত হ'তে পারবেন।

কিন্তু সম্রাট আকবর ও তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান মনীষীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং অক্লান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমানের পরধর্মদ্বেষিতাটা মাঝে মাঝে প্রকটিত হ'য়ে উঠতো।

আকবর সুশাসক হ'লেও তখনো পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দুদের কাছে ছিলেন বহিরাগত,—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী মাত্র। কেবল হিন্দুদের কাছে নয়, ভারতে মোগলদের পূর্বে এসেছেন এবং বসবাস করেছেন এমন মুসলমানদের কাছে-ও। তাই অনেক সময় রাজনীতিক অর্থনীতিক কারণগুলিও ধর্ম-সংক্রান্ত বৈরিতায় ইন্ধন জোগাতো। ফলে মাঝে মাঝে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘটতো ভয়াবহ সংঘর্ষ,—পারস্পরিক ধর্ম সম্বন্ধে চরম অসহিষ্ণুতা। এমনি একটি ঘটনা ঘটে মথুরায়। মথুরার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কলহ বাধায় হিন্দুরা কয়েকটি মসজিদ ধূলিসাৎ ক'রে দেয়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় বিক্ষোভ। মুসলমান জনসাধারণের এই বিক্ষোভকে একটি বিরাট সামাজিক অগ্নিকাণ্ডে পরিণত করার উদ্দেশ্যে প্ররোচনা দিতে থাকেন মুসলমান ধর্মযাজক গোঁড়া দরবেশরা। ধর্মসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই দরবেশদের নির্দেশ বা সিদ্ধান্তই ছিল মুসলমানদের পক্ষে অমোঘ এবং চূড়ান্ত। "সীজারকে দাও সীজারের প্রাপ্য এবং ভগবানকে ভগবানের,"—এই নীতির অপভ্রংশ মুসলমান সমাজেও ছিল প্রচলিত। একটি রাজতন্ত্রের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে বর্তমান ছিল একটি ধর্মতন্ত্র—যার কর্ণধার ছিলেন দরবেশরা। কারণ দরবেশরাই ছিলেন খোদার খাস দপ্তরের তহশীলদার।

ফলে রাজতন্ত্রের সংগে ধর্মতন্ত্রের সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে পড়লো।

আবুল কালাম আজাদ

সম্রাট আকবর এবং তাঁর অমাত্যরা যখন সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমানের সহযোগিতায় ও সৌহার্দ্যে একটিমাত্র জাতীয় সমগ্রতা গ'ড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তখন গোঁড়া সংকীর্ণমনা দরবেশরা চাইছেন ভারতে অখণ্ড এক ধর্ম-সাম্রাজ্য বিস্তার করতে—যে সাম্রাজ্যে বিধর্মীর স্থান বড়ো সংকীর্ণ। ফলে পার্থিব সাম্রাজ্য এবং অপার্থিব সাম্রাজ্য পরস্পরের প্রসারের পথে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠলো। বোঝা গেল, ধর্ম সম্পর্কে দরবেশদের এই সার্বভৌমতা যতোদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, ততোদিন হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্য স্থাপনের সকল রাজকীয় প্রচেষ্টাই হবে পংগু, সুতরাং সাম্রাজ্য-শাসনের সকল ব্যবস্থাই হবে ব্যর্থ। আবুল ফজলের দৃষ্টি ছিল যেমন ক্ষুরধার, কর্মশক্তিও ছিল তেমনি অদম্য। পিতা মোল্লা মোবারকের সাহায্যে তিনি চাইলেন ধর্ম-সংক্রান্ত সার্বভৌমতা থেকে দরবেশদের বঞ্চিত ক'রে সেই চূড়ান্ত শক্তিকে সম্রাটের স্বহস্তে আরোপ করতে। এ-জন্যে প্রয়োজন ছিল স্বকীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ ক'রে তা সম্রাটের হস্তে অর্পণ করার জন্যে দরবেশদের প্ররোচিত প্রবুদ্ধ করা। দরবেশদের ওপর মোল্লা মোবারকের প্রভাব ছিল অসামান্য এবং সম্রাট আকবরের প্রতি মুসলমান জনসাধারণ ও দরবেশদেরও আস্থা ছিল প্রচুর। ফলে, দরবেশগণ এক সম্মেলন আহ্বান ক'রে একটি ইস্তাহার রচনা করলেন। এই ইস্তাহারে ঘোষণা করা হোলো, সম্রাট আকবর ন্যায়বান সম্রাট, সুতরাং তাঁকে ইসলাম সংক্রান্ত সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নির্দেশক ও বিধায়ক ব'লে গণ্য করা গেলো। এই ঘোষণাপত্রে সর্বপ্রথমে স্বাক্ষর করলেন মোল্লা মোবারক স্বয়ং। তারপর তিনি দেশের অন্যান্য সকল শীর্ষ স্থানীয় দরবেশদেরও স্বাক্ষরের জন্যে করলেন আমন্ত্রণ। আগ্রা, জৌনপুর, দিল্লী এবং অন্যান্য বহু স্থানের দরবেশরা এই ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করলেন সানন্দে।

কিন্তু দিল্লীর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের বিরুদ্ধেও দুঃসাহসিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল একক কণ্ঠে। সকল প্রকার রাজরোষকে হেলায় উপেক্ষা ক'রে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সংগে এই প্রতিবাদী ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের সংমিশ্রণ অসম্ভব। কেবল অসম্ভব নয়, তার চেষ্টাও অনিষ্টকর। তাঁর এই প্রতিবাদ ছিল সত্যাগ্রহীর প্রতিবাদ, বিশ্বাসে দৃপ্ত, লাঞ্ছনায় নির্ভীক, স্পর্ধায় কঠোর, অটল।

এই প্রতিবাদী আর কেউ নন,—আধুনিক ভারতের অন্যতম দুঃসাহসিক বিদ্রোহী সত্যাগ্রহী আবুল কালাম আজাদের পূর্বপুরুষ, শেখ জামালুদ্দিন দেহলাভি।

শেখ জামালুদ্দিনের সমাজে প্রতিষ্ঠা ছিল যেমন অসাধারণ, মুসলমান ধর্ম শাস্ত্রে তাঁর জ্ঞান ও গভীর পাণ্ডিত্যও ছিল তেমনি অতুলনীয়। মুসলিম ইতিহাসে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায় 'রহিমুতুল্লা আলি' বা 'ভগবানের প্রিয়-পাত্র' এই নামে। দেশে তাঁর শিষ্য সংখ্যাও ছিল অসংখ্য। সম্রাট আকবরের ভ্রাতা খান ই আজম ছিলেন তাঁর অন্যতম শিষ্য। শেখ জামালুদ্দিন বহু পুস্তক রচনা করেন, যেগুলির কদর অক্ষুণ্ণ রয়েছে এখনো। হাদিস বা ইসলামিক ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি একটি টিকা রচনা করেন। হাদিস মুসলমান দরবেশদের অত্যন্ত পবিত্র ও প্রামাণ্য গ্রন্থ। শেখ জামালুদ্দিনের পাণ্ডিত্য সম্রাট আকবরকে মুগ্ধ করে। তাই আকবর তাঁকে কেন্দ্রীয় ধর্মায়তনের প্রধানতম কর্তা নিযুক্ত ক'রে সম্মানিত করতে চান। কিন্তু সম্মান বা পুরস্কারের প্রত্যাশী ছিলেন না শেখ জামালুদ্দিন। তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবন ছিল যেমন শুভ্র, তাঁর দৈনন্দিন দিনগুলিও ছিল তেমনি বিলাস-বিভবহীন, সত্য-সন্ধানে কৃচ্ছ্র। সুতরাং সেখানে জাগতিক তুচ্ছ গৌরবের হ্রাসবৃদ্ধির মূল্য ছিল কোথায়? সম্রাটের প্রদত্ত সম্মানকে

শেখ জামালুদ্দিন সেদিন ধন্যবাদের সংগে প্রত্যাখ্যান করলেন। শেখ জামালুদ্দিনের উপযুক্ত বংশধর মওলানা আবুল কালাম আজাদের মধ্যেও আমরা এই একই সম্মান বা পুরস্কার-বিমুখতা লক্ষ্য করি।

সম্রাট আকবর যখন ধর্মকে রাষ্ট্রের অন্তর্গত করতে চাইলেন, তখন বস্তুত পক্ষে তা হোলো,—তা যতোই রাজনীতিক বা সমাজনীতিক মাংগলিকতায় পূর্ণ ই হোক না কেন—পার্থিব বিষয়ের নিকট অপার্থিবকে পদানত করা। রাষ্ট্রের সংগে ধর্মের মিলনের অর্থ হোলো ধর্মের স্বকীয় পূর্ণতার হানি, যা যে কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষেই ছিল অস্বীকার্য, অসহনীয়। তাই শেখ জামালুদ্দিনের এই দুঃসাহসিক প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদের জন্যে শেখ জামালুদ্দিনকে রাজরোষে পড়তে হ'য়েছিল কিনা তার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে মক্কা চলে গিয়েছিলেন।

শেখ জামালুদ্দিন দেহ্‌লাভি মওলানা আবুল কালামের ঊর্ধ্বতন নবম অথবা দশম পুরুষ।

মওলানা আবুল কালামের অন্যান্য পূর্বপুরুষেরাও সকলেই মহাপণ্ডিত এবং সুফীবাদ বা মিষ্টিসিজমের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। তাঁদের অনেকের মধ্যেই এই দুঃসাহসিক বিপ্লবী মনোবৃত্তি এবং অটুট ধর্মপ্রাণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন সম্রাট আকবরের পুত্র জাহাংগীরের রাজত্বকাল। মওলানা আবুল কালামের অন্যতম পূর্বপুরুষ শেখ মহম্মদ ছিলেন দিল্লীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। এই সময় অকস্মাৎ সম্রাটকে কুর্ণিশ করার প্রথার প্রচলন হোলো। এবং এই কুর্ণিশ সকলের পক্ষেই হোলো

করণীয়, এমন কি দরবেশদের পক্ষেও। দিল্লীর অধিকাংশ দরবেশই এই প্রথাটিকে স্বীকার ক'রে নিলেন। কিন্তু শেখ জামালুদ্দিনের বংশধর, শেখ মহম্মদ কুর্ণিশ করতে রাজী হলেন না। তিনি জানালেন, ভগবানের প্রাপ্য নমস্কার এই কুর্ণিশ, কোনো পার্থিব শাসক, তিনি যতোই শক্তিমান হোন না কেন, এতে তাঁর অধিকার নেই। আকবরের রাজত্বকালে রাজার বিরোধিতা ক'রেও একদা শেখ জামালুদ্দিন নিষ্কৃতি পেতে সমর্থ হ'য়েছিলেন। কিন্তু এবার রাজরোষ থেকে নিষ্কৃতি পেলেন না শেখ মহম্মদ। তিনি গোয়ালিয়র কারাদুর্গে নিক্ষিপ্ত হ'লেন।

সকল প্রকার সম্মান ও পুরস্কারকে যেমন চিরদিন তুচ্ছ ক'রে এসেছেন আবুল কালামের পূর্বপুরুষেরা, তেমনি বহুদিন পর্যন্ত রাজকীয় কোনো নিয়োগকেও তাঁরা করেন নি গ্রহণ। পরবর্তীকালে আবুল কালামের অন্যতম প্রপিতামহ শেখ সিরাজুদ্দিন মোগল সম্রাটের অধীনে প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁর পরে অবশ্য এ বংশের অনেকেই তাঁর পদাংক অনুসরণ করেছেন। আবুল কালামের পিতামহ মোগল সম্রাট কর্তৃক মোগল সাম্রজ্যের শেষ রকন্-উল-মাদ্রাসিন (জ্ঞানের স্তম্ভ) নিযুক্ত হ'য়েছিলেন।

মওলানা আবুল কালামের সুদীর্ঘ সমুন্নত দেহ, দৃপ্ত চক্ষু, প্রগাঢ় জ্ঞান, মার্জিত আভিজাত্য, সকল কিছুই তাঁর এই সুপ্রাচীন সম্ভ্রান্ত রক্তেরই পরিচয় দেয়। মওলানা সাহেব অন্যান্য জননেতাদের মতো জনসাধারণের সংগে মেলামেশা করেন না, একটি অদৃশ্য গণ্ডী তাঁকে সাধারণের সংস্পর্শ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে, এমন অভিযোগ যাঁরা করেন, তাঁরাও জানেন, এই দূরত্ব কেবল মাত্র মওলানা সাহেবের মধ্যেই সহজ এবং স্বাভাবিক। এর মধ্যে কোনো প্রকার দম্ভ নেই, নেই আত্মম্ভরিতা, নেই জনসাধারণের

প্রতি অবহেলা বা ঘৃণা। এই অনন্যসাধারণত্ব তাঁর রক্তগত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে এই বংশ যে বিদ্রোহীর দুঃসাহস, সত্যের প্রতি নির্ভীক নিষ্ঠা, জ্ঞানের গভীরত্ব, ত্যাগের ও আত্মসংযমের মহিমা দেখিয়ে এসেছে, মওলানা আবুল কালাম সেই ঐতিহ্যের নিপুণ বাহক এবং যোগ্য উত্তরাধিকারী মাত্র। তবে একটি বিষয়ে মওলানা আবুল কালাম তাঁর পূর্বপুরুষদের চেয়েও অগ্রসর হয়েছিলেন—সেটি শিষ্য গ্রহণের ব্যাপারে। মওলানা সাহেবের পূর্বপুরুষদের ছিল অসংখ্য শিষ্য, তাঁরা নিয়মিত ভাবে করতেন গুরুগিরি। কিন্তু মওলানা সাহেব কোনো শিষ্যগ্রহণ করেন নি। কারণ, তিনি জানেন, তিনি জ্ঞানের অধিকারী নন—জ্ঞানের সন্ধানী মাত্র। তিনি জানেন, তিনি নিজেই পথের অন্বেষণ করছেন, সুতরাং পথপ্রদর্শনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই অসংখ্য শিষ্য সামন্ত পরিবৃত মঞ্চে তাঁর আসন হয় নি,—তাঁর আসন হয়েছে অসংখ্য স্তূপীকৃত গ্রন্থে রচিত বিদ্যায়তনের নির্জন বেদীমূলে। তিনি জ্ঞানের যাজক বা পুরোহিত নন, তিনি জ্ঞানের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।

দুই

মওলানা আবুল কালামের অন্যান্য পূর্বপুরুষদের মতোই তাঁর পিতা মহম্মদ খইরুদ্দিনও ছিলেন মহাপণ্ডিত, তখনকার দিল্লীর অন্যতম খ্যাতনামা দরবেশ এবং সুফী। আরবিক ও পারশিক ভাষায় তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর বাইরের জীবন ছিল যেমন বিভব-বিলাসহীন, তাঁর আভ্যন্তরীণ জীবনও ছিল তেমনি নির্লিপ্ত শুচি। সম্প্রদায় নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। ব্যক্তিগত শিষ্যেরও অভাব ছিল না তাঁর। কেবল দিল্লীতে নয়, ভারতের পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্ত বহু স্থানেই, গুজরাটে, কাথিওয়াড়ে, বোম্বাই-এ কলিকাতায় ছিল তাঁর হাজার হাজার শিষ্য। এই শিষ্যদের মধ্যে আমীর ওমরাহ থেকে দুঃখী-দরিদ্র পর্যন্ত সকল প্রকার লোকই ছিলেন।

জ্ঞানার্জন, ধর্মালোচনা এবং যাজকতা ক'রেই হয়তো মহম্মদ খইরুদ্দিনের দিনগুলি কেটে যেতো নির্বিবাদে শান্তিতে, যদি অকস্মাৎ না সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জলে উঠতো ভারতে। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে দিল্লীর বিদ্রোহী সিপাহীদের পরাজয় ঘটলো। ফলে দিল্লী শহরে শুরু হোলো বৃটিশ সামরিক শাসনের এক বর্বর অধ্যায়। বিদ্রোহীরা বহু হিংসাত্মক কার্য করেছিল সত্য, কিন্তু তাদের সমস্ত কুকীর্তিকে ম্লান ক'রে দিল বৃটিশ সামরিক শাসনের নৃশংস অত্যাচার। দিল্লী শহরের বিদ্রোহীরাই যে কেবল নির্বিকারে প্রাণ হারালো তাই নয়, শিশু বৃদ্ধ নারী নির্বিশেষে আশ্রয়প্রার্থীদেরও সংগীনের গুঁতোয় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা হোলো। নিরীহ নির্দোষ নরনারী, শিশু বৃদ্ধের মৃতদেহে দিল্লীর রাজপথ গেলো ভ'রে। পরিত্যক্ত গৃহগুলিতে চললো লুণ্ঠন, ধ্বংস, অগ্নিকাণ্ড। দলে দলে দিল্লী ত্যাগ ক'রে মানুষ

পলাতে লাগলো। মওলানা আজাদের পিতা মহম্মদ খইরুদ্দিনও দিল্লী ত্যাগ ক'রে পলাতে সংকল্প করলেন এবং বৃটিশ হত্যাকারীদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কোনো রকমে এসে পৌছলেন রামপুরে। রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খান ছিলেন খইরুদ্দিনের শিষ্য। আর এই ইউসুফ আলি খান বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে বৃটিশদের করছিলেন সাহায্য। সুতরাং বৃটিশ অত্যাচারের কবল থেকে খইরুদ্দিন নিষ্কৃতি পেলেন। নবাব ইউসুফ আলি খান তাঁর গুরুদেবকে নির্বিঘ্নে পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। খইরুদ্দিন বোম্বাই থেকে রওনা হ'লেন মক্কা।

ঐ সময় তুরস্কের সুলতান ছিলেন আবদুল মজিদ। তিনি মওলানা মহম্মদ খইরুদ্দিনের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে কনস্টাণ্টিনপলে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। সুলতানের সুপারিশে ও সাহায্যে মওলানা খইরুদ্দিন প্রণীত বহু পুস্তকও প্রকাশিত হোলো কাইরো থেকে। ঐ সময় মওলানা মক্কার বিখ্যাত খাল আইন জুবাইদার সংস্কার উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্যে কনস্টাণ্টিনপল থেকে চলে এলেন এবং ভারতে ও ভারতের বাইরে তাঁর বহু শিষ্য ও বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন খাল খননের জন্যে প্রয়োজনীয় এগারো লক্ষ টাকা। মক্কাতে মওলানা খইরুদ্দিনের সম্মান ও প্রতিষ্ঠার সীমা রইলো না।

এই সময় মক্কায় বর্ধিষ্ণু এবং পাণ্ডিত্যের জন্যে খ্যাতিমান ছিলেন শেখ মহম্মদ জাহির ওয়াত্রি। শেখ মহম্মদ জাহির ওয়াত্রির কন্যার সংগে মহম্মদ খইরুদ্দিনের শুভ পরিণয় ঘটলো। এই পরিণয়ের ফলেই ১৮৮৮ খৃস্টাব্দে মওলানা আবুল কালাম আজাদের জন্ম হয়। এইরূপে আবুল কালাম বিদ্যায় ও বংশাভিজাত্যে যে কেবল পিতৃকুলের উত্তরাধিকারীই হলেন, তাই নয়, মাতৃকুলের সকল জ্ঞান-সম্পদ এবং বংশ মর্যাদাও হোলো

তাঁর মজ্জাগত। মুসলমানদের কাছে মওলানা আজাদের কৌলিন্য ঈর্ষার বস্তু। কারণ, তাঁর পিতৃকুল ও মাতৃকুল দুটিই ছিল শেখ গোষ্ঠীভুক্ত।

শেখ মহম্মদ খইরুদ্দিন ভারত ত্যাগ করার ফলে তাঁর ভারতীয় শিষ্যরা অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন এবং মওলানা সাহেবকে ভারতে ফিরে আসার জন্যে তাঁরা ক্রমাগতই অনুরোধ করতে থাকেন। অবশেষে ১৮৮০ খৃস্টাব্দে তাঁর একদল শিষ্য কাথিওয়াড় থেকে মক্কায় তীর্থ করতে যান। তাঁদের সনির্বিন্ধ অনুরোধ মওলানা সাহেব আর এড়াতে পারলেন না। ফলে ঐ সময় তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। অবশ্য, ঐ সময় তিনি ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারেন নি। তাঁর পরিবার তখনো মক্কাতেই ছিলেন। তাই তাঁকে ১৮৮০ থেকে ১৮৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায়ই ঘন ঘন বোম্বাই থেকে মক্কা এবং মক্কা থেকে বোম্বাই যাতায়াত করতে হোতো। অবশেষে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে তাঁর অন্যতম শিষ্য হাজি আবদুল ওয়াহিদের ক্রমাগত অনুরোধের ফলে তিনি মক্কা ত্যাগ ক'রে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে চ'লে আসেন এবং কলিকাতায় বসবাস করতে শুরু করেন। বালক আবুল কালামের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর।

সুতরাং দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মওলানা আবুল কালামের আরব দেশেই কাটে। আর এই দশ বৎসর বয়স অন্যান্য বালকের পক্ষে নিতান্ত বাল্যকাল হ'লেও আবুল কালামের পক্ষে কিন্তু তা তেমনটি ছিল না—কৈশোরে তাঁর মন কী পরিমাণ পরিণতি লাভ করেছিল, লক্ষ্য করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাল্যকালটি আরবদেশে কাটানোর ফলে যে-আরবিক ভাষায় মওলানা আজাদ একদিন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হ'য়েছিলেন, তার প্রাথমিক পাঠ তিনি পেয়েছিলেন মাতৃকুলের আত্মীয় স্বজনের এবং খেলার সাথীদের কাছেই। বস্তুত, আরবিক ভাষাই ছিল মওলানা আজাদের

মাতৃভাষা। কারণ তাঁর মা আরবিক ছাড়া আর অন্য কোনো ভাষা জানতেন না।

কলিকাতা আসার পর বালক মওলানা আজাদ তাঁর পিতার কাছে উর্দু ভাষা শিখতে লাগলেন। ফলে, আরবিক এবং উর্দু দু'টি ভাষাতেই তাঁর সমান দক্ষতা লাভ হোলো। মওলানা আজাদের মধ্যে অতি সাধারণ বয়সেই পরিচয় পাওয়া গেলো অসাধারণত্বের। মওলানা মহম্মদ খইরুদ্দিন তাঁর পুত্রকে স্কুল-কলেজে পাঠাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে তখন ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দা প্রচলনের জন্যে সার সৈয়দ আমেদ খান প্রচুর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সে-চেষ্টাকে মওলানা খইরুদ্দিন প্রশ্রয় দিলেন না। তাই ইংরেজি স্কুল-কলেজে বালক মওলানা আজাদের শিক্ষার ব্যবস্থা না হ'য়ে হোলো তাঁর পিতার ও পিতৃবন্ধুদের কাছে। তিনি ন্যায়, দর্শন, অংকশাস্ত্র, ভূগোল এবং ইতিহাস, সমস্তই আরবিক ও পারসিক ভাষার মারফত শিখতে লাগলেন। এই বিষয়গুলি পরিপূর্ণরূপে অধিগত করতে সাধারণ ছাত্রের প্রায় দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর এবং তীক্ষ্ণধী ছাত্রের প্রায় দশ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু জাদুকরের মতো শক্তি ছিল বালক আজাদের। চার বৎসরের মধ্যেই এই বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ক'রে ফেললেন তিনি। এই বিষয়গুলি কেবল যে নিজে আয়ত্ত করলেন তাই নয়, মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি এই সকল বিষয়ে অধ্যাপনা করতে-ও সমর্থ হ'লেন। আরবিক ও পারসিক ভাষায় এই বিভিন্ন বিষয়ের পূর্ণাংগ শিক্ষাকে বলা হয় 'দরস্-ই নিজামি'। 'দরস্-ই নিজামি' শিক্ষার নিয়ম অনুসারে কোনো বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের প্রমাণ হোলো সেই বিষয়ে শিক্ষা দানের ক্ষমতা লাভ। এটা আমাদের ইংরেজি শিক্ষাব্যবস্থা অনুযায়ী

তিরিশ নম্বর পেয়ে পাশ করার মতন নয়। কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ অধিকার না থাকলে সে-বিষয়ে অধ্যাপনা করা অসম্ভব। সুতরাং 'দরস্-ই নিজামি' শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে সেই-ছাত্র তখনই পারদর্শী বা পাশ্‌ড্‌ ব'লে গণ্য হবে, যখন কোনো বিষয়ে সে শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জন করবে। অতি শৈশবেই আরবিক ভাষায় শিক্ষালাভ করায় বালক আজাদ অল্প সময়ের মধ্যেই সুচারুরূপে অধ্যাপনার কাজ করতে সমর্থ হ'লেন। পরবর্তী কালে তিনি তাঁর জীবনীকার পরলোকগত মহাদেব দেশাইর কাছে এ সম্পর্কে একটি সুন্দর কাহিনীর উল্লেখ করেন। কাহিনীটি এইরূপ :

বালক আবুল কালামের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন এক বৃদ্ধ দরিদ্র পাঠান। পক্কশ্মশ্রু এই বৃদ্ধকে দেখলে সহজেই শ্রদ্ধা জাগত। কিন্তু বৃদ্ধের মস্তিষ্কে বুদ্ধির একটু অপ্রাচুর্য ছিল। ফলে, নিজে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হওয়ায় বৃদ্ধের এই নির্বুদ্ধিতাটাকে কিশোর আবুল কালামের কাছে কেবল অস্বাভাবিক মনে হোতো না, মনে হোতো অপরাধ ব'লে। লজিক বা ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করছিলেন আবুল কালাম। তিনি ক্রমাগত কয়েকদিন ধ'রে এই বৃদ্ধকে বোঝাচ্ছিলেম, লজিক দুই প্রকার : কাইয়াস্ বা অবরোহী (deductive) এবং ইস্তাক্রা বা আরোহী (inductive)। কাইয়াস্ বা অবরোহী হোলো সেই লজিক যা সাধারণ বা নির্বিশেষ থেকে বিশেষের দিকে অবরোহণ করে অর্থাৎ নামে। আর ইস্তাক্রা বা আরোহী হোলো সেই লজিক যা নির্বিশেষ বা সাধারণের দিকে করে আরোহণ। অর্থাৎ কাইয়াস্ অবরোহণ করছে আর ইস্তাক্রা করছে আরোহণ। এই ব্যাপারটি চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক আজাদের নিকট জলবৎ তরল হ'লেও তাঁর সপ্ততিবর্ষীয় ছাত্রের কাছে ছিল সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। এই ব্যাপারটি বারংবার

বোঝানো সত্ত্বেও পরদিন আবার বৃদ্ধ ব্যাপারটি গুলিয়ে ফেললেন—তাঁর মস্তিষ্কের মধ্যে নির্বিবাদে কাইয়াস্ করলো আরোহন এবং ইস্তাক্রা করলো অবরোহন। কয়েক দিন ক্রমাগত অধ্যাপনায় ব্যর্থ হবার পর আজ কিশোর গুরু আজাদের সম্পূর্ণ ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি পাঠ্যপুস্তকখানি বৃদ্ধের মুখের উপর নিক্ষেপ ক'রে ব'লে উঠলেন: 'তোমার দ্বারা এসব শেখা হবে না। যাও বাপু, বাড়ি গিয়ে ঘাস খাও।'

তিরস্কৃত হ'য়ে বৃদ্ধ ছাত্র লজ্জিত মুখে বাড়ি ফিরে গেলেন এবং সমস্ত দিন রইলেন অনাহারে। ব্যাপারটা আবুল কালামের পিতার কানে গেলো। তিনি পুত্রের এই আচরণে অত্যন্ত মর্মাহত এবং রুষ্ট হ'লেন। অবিলম্বেই ডাক পড়লো পুত্রের। আবুল কালাম পিতার কক্ষে উপস্থিত হ'লে মওলানা খইরুদ্দিন পুত্রকে ভৎর্সনা ক'রে বললেন:

"তিনি তোমার বাবার বয়সী। তাঁর প্রতি তোমার এইরূপ রূঢ় আচরণ করতে এতোটুকুও লজ্জা বোধ হোলো না? অবিলম্বে তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাও এবং তাঁকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো।"

আবুল কালাম নিজেও এজন্যে লজ্জিত হ'য়েছিলেন। পিতার তিরস্কার তাঁকে আরো লজ্জিত করলো। তিনি বৃদ্ধ পাঠানের নিকট উপস্থিত হলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাপারটিকে এমনভাবে নিলেন, যেন কিছুই ঘটে নি। তিনি রূঢ় আচরণের জন্যে আজাদকে বিন্দুমাত্র অপরাধী তো করলেন-ই না, বরং জানালেন যে আবুল কালাম কিশোর হ'লেও গুরু এবং তিনি বৃদ্ধ হ'লেও ছাত্র। ছাত্রকে তিরস্কার করার, শাস্তি দেওয়ার পূর্ণ অধিকার রয়েছে শিক্ষকের।

বৃদ্ধের এই অসাধারণ সৌজন্যে আবুল কালাম আরো লজ্জিত ও বিব্রত

হ'য়ে পড়লেন এবং পিতৃতুল্য এই বৃদ্ধের আহার সমাধা করিয়ে তবে বাড়ী ফিরলেন।

ইংরেজরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার ক'রেছিল, তখন মুসলমানদের চেয়েও হিন্দুরা বৃটিশ-শাসনের সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রেছিলেন অনেক বেশি। ফলে, বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের আগমনের সংগে সংগে ভারতে একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ গ'ড়ে উঠেছিল;অর্থাৎ, হিন্দুরা পুঁজিবাদী সমাজের অপরিহার্য শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি, নীতি, আচার-সংস্কৃতি, আদবকায়দা গ্রহণ করেছিল সাগ্রহে সানন্দে। কিন্তু মুসলমানেরা বৃটিশের আগমনকে এতো সহজে ও সত্বরে স্বীকার ক'রে নিতে পারে নি। তাই তারা পুঁজিবাদী সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, ও সমাজ-সংস্কৃতিকে, পুঁজিবাদী ব'লে নয়, বিধার্মিক ব'লে বয়কট ক'রে বসলো। এর ফল কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে আদৌ শুভ হোল না। বৃটিশ প্রসাদে হিন্দুরা যখন নবাগত পুঁজিবাদের লেজ ধ'রে অনেক দূর এগিয়ে গেলো, তখন মুসলমানেরা প'ড়ে রইলো প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক শিক্ষা, কুশিক্ষা, বিশ্বাস, অবিশ্বাস এবং অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল এক সংকীর্ণতার আওতায়, বদ্ধ ডোবায় রুদ্ধ জলের মতো। ঐ সময় মুসলমান নেতৃত্বে দেশে যে সমস্ত আন্দোলন হোলো, সেগুলিও হোলো মূলত প্রতিক্রিয়াশীল—সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনা রইলো বর্তমানকে অস্বীকার ক'রে অতীতে ফিরে যাওয়ার। তাই ওয়াহাবি প্রভৃতি আন্দোলনগুলি সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ-শাসনের বিরোধী হ'লেও আসলে সে-গুলি প্রগতিশীল ছিল না—ছিল এক অতীত সমাজ ব্যবস্থাকে রক্ষা বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার প্রবল চেষ্টা মাত্র। ফলে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্র ভারতে স্বকীয় ক্ষমতা বিস্তারের পক্ষে মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য বা সহায়ক ব'লে

বিশ্বাস করলো না। অতএব হিন্দুরা হ'য়ে উঠলো বৃটীশ সাম্রাজ্যবাদের সুয়োরাণী। বৃটিশ পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের শিক্ষা-দীক্ষায় ও আচার-সংস্কৃতিতে 'নবজাগ্রত' হিন্দু-সমাজ অলংকৃত করলো আপনার দেহকে।

প্রত্যেক ক্রিয়ারই থাকে প্রতিক্রিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটিশ শিক্ষা-সংস্কৃতি-বিদ্বেষী মুসলমানরা বৃটিশ পুঁজিতান্ত্রিক প্রসাদের জন্যে হ'য়ে উঠলো লালায়িত—ভারতীয় রাষ্ট্র-জীবনে হিন্দুদের স্থলে তারা আপনাদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলো সুয়োরাণী রূপে। তখন মুসলমানদের বৃটিশ তোষণের রীতিটা হ'য়ে উঠলো অনেক পরিমাণে নির্লজ্জ এবং হাস্যকর। মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ বৃটিশ জয়জয়কারে মুখরিত হ'য়ে উঠলো। অকস্মাৎ এই নবাগত বৃটিশ-বৈতালিকদের পুরোভাগে রইলেন সার সৈয়দ আহমদ খান। সার সৈয়দের ব্যক্তিত্ব ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসাধারণ। তিনি তদানীন্তন বৃটিশ শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতিকে অর্থাৎ পুঁজিতান্ত্রিক সভ্যতাকে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণের জন্যে উদ্‌বুদ্ধ করতে লাগলেন মুসলমান সমাজকে। তাঁর ঐ সময়কার উদ্‌বোধনী ঘোষণাগুলি এমন সপ্তমে এসে পৌছতে লাগলো যে, আজকের বৃটিশ-বিদ্বেষী স্বদেশভক্ত হিন্দু-মুসলমানের কাছে তা কেবল বিরক্তিকর নয়, সম্পূর্ণ অপমানজনক মনে হবে। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে লণ্ডন থেকে তিনি যে পত্র লেখেন তার একাংশ নিম্নলিখিত রূপ :

"Without flattering the English I can truly say that the natives of India, high and low, merchants and petty shopkeepers, educated and illiterate, when contrasted with the English in education, manners and uprightness, are as like them as a dirty animal

is to an able and handsome man. The English have reasons for believing us in India to be imbecile brutes."

সার সৈয়দ আহমদ খানের এই উক্তি আজকের জাতীয়তাবাদী হিন্দু-মুসলমানের নিকট যতোই তিক্ত ও অপমানজনক মনে হোক, বা এর মধ্যে যতোই অতিভাষণ থাক না কেন, তবু এর ব্যবহারিক দিকটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুপ্ত মুসলমান জাতিকে জাগাবার জন্যে তার বিবেকে কঠিনতম, এমন কি, অসম্মানজনক আঘাত হানার একান্ত প্রয়োজন ছিল। মুসলমান সম্প্রদায় তার সামন্ততান্ত্রিক অবয়ব ছেড়ে হ'তে চাইলো পুঁজিতান্ত্রিক। তখনকার সমাজে এই-ই প্রগতি। বৃটিশ আগমনের সময় থেকে কোরানের বাণীর যে ভাবে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্র বিরোধী ব্যাখ্যা চ'লে আসছিল, তার হোলো পরিবর্তন। মহম্মদের জীবনী রচনা হ'তে লাগলো। মহম্মদের ব্যক্তিত্বকে আনা হোলো পুরোভাগে। উদীয়মান পুঁজিতন্ত্রের প্রথম কথা হোলো ব্যক্তিকে স্বীকার করা। মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনের এই পর্যালোচনার মধ্যেই এই ব্যষ্টিবাদী পুঁজিতন্ত্রেরই অভ্যর্থনার স্পষ্ট লক্ষণ দেখা গেলো।

কেবল ধর্ম-সংক্রান্ত প্রচারের মধ্য দিয়েই নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়েও মুসলমান সম্প্রদায়ের মনকে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজকে গ্রহণ করার উপযোগী ক'রে তোলার প্রয়োজন হোলো। এ-কার্যেও আত্মনিয়োগ করলেন সার সৈয়দ। তিনি মুসলমান জনসাধারণকে প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে প'ড়ে থেকে অতীতের গৌরবময় স্মৃতির স্বপ্ন দেখতে নিষেধ করলেন, ঘোষণা করলেন:

"The fatal shroud of complacent self-esteem is wrapt around the Mohomedan community. They

remember the old tales of their ancestors, and think that there are none like themselves. The Mahomedans of Egypt and Turkey are daily becoming more civilized. Uutil the education of the masses is pushed on as it is here (in England), it is impossible for a native to become civilized and honoured. Those who are bent on improving and bettering India must remember that the only way of compassing this is by having the whole of arts and sciences into their own language."

পাশ্চাত্য কলাশিল্প এবং বিজ্ঞানের সংস্পর্শে দেশীয় মুসলমানদের আনার জন্যে সার সৈয়দ অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন এবং ১৮৮০ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ মওলানা আবুল কালামের জন্মের আট বৎসর পূর্বে তিনি পশ্চিমী শিক্ষা-প্রচারের জন্যে আলিগড়ে এম . এ . ও - কলেজ প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হ'লেন। এই কলেজে অধ্যাপনার জন্যে এলেন বিলাত থেকে বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকেরাও। এইরূপে মুসলমান সমাজে বৃটিশ সংস্কৃতি ও শিক্ষার ধারাকে প্রসারিত করার কেন্দ্র রূপে একদা আলিগড়ের এই কলেজ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হোলো এবং বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের সহযোগিতায় গ'ড়ে তুললো একটি মসলেম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ বা 'intelligentsia.'

আর তখন এই অলস মন্থর পূর্বমুখী মুসলমান সমাজকে ধনতান্ত্রিক সমাজে কর্মী ভাবে অংশ গ্রহণ করাবার কাজে নিয়োগ করতে হোলে যেমন প্রয়োজন ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার, তেমনি আবশ্যক ছিল বৃটিশ শাসক-

দের অকৃপণ কৃপার। কাজেই সার সৈয়দ বৃটিশ তোষণের বিজয় পতাকা স্কন্ধে নিয়ে পথে নামলেন। বৃটিশ তোষণের এই মিশনে সার সৈয়দের সুযোগও ঘটলো প্রচুর। কারণ ইতিমধ্যেই বৃটিশ ধনতান্ত্রিক সমাজের সমাজ ব্যবস্থার উদরে হিন্দু ধনতান্ত্রিক সমাজের যে ভ্রূণ একদা জন্মলাভ করেছিল, তা একটি স্বয়ম্পূর্ণ স্বাধীন সমাজসত্তায় পূর্ণতা লাভ করতে চাইলো।

ধনতন্ত্রের এই আত্মবিধ্বংসী রূপ সকল দেশেই দেখা গেছে। জলের মতো পুঁজি নিম্নগামী। কেবলই উন্নত সমাজ থেকে অনুন্নত সমাজের দিকে তার গতি। অর্থাৎ তা যেখানে শ্রমিকের মূল্য স্বল্পতর—সে দিকেই সর্বদা ধাবিত হ'তে থাকে। কিন্তু পুঁজি যখন অনুন্নত সমাজে আসে, তখন সেখানে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে কুশলী শ্রমিকের দল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যানবাহনের ব্যবস্থা প্রভৃতি। তার ফলে সেখানে জেগে ওঠে স্থানীয় একটি পুঁজিতন্ত্র। এমনিভাবে এই নবজাত স্থানীয় পুঁজিতন্ত্রের সংগে ঘটে বিদেশী পুঁজিতন্ত্রের বিরোধ। ভারতে-ও এই রাসায়নিক রীতির ব্যতিক্রম ঘটলো না। তরুণ ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগে প্রাচীন বৃটিশ বুর্জোয়ার সংঘাত অপরিহার্য হ'য়ে পড়লো। বৃটিশ বুর্জোয়ারা ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়াদের এই অনিবার্য অভ্যুত্থান লক্ষ্য করলেন এবং ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়া শ্রেণী তখনো সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল না হওয়ায় বৃটিশ বুর্জোয়াদের সংগে চাইলেন একটা আন্দোলন অথচ আপোষ। ফলে তারা সংঘাত অথচ সহযোগিতার মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করলেন। এই এককালীন আন্দোলন-আপোষ বা সংঘাত ও সহযোগিতার কাজে যেমন এগিয়ে এলেন বৃটিশ ব্যুরোক্রাসির সুধী ব্যক্তিরা, তেমনি এগিয়ে এলেন হিন্দু বুর্জোয়াদের বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিরা। ফলে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হোলো প্রতিষ্ঠা। এই সময়কার

আবুল কালাম আজাদ

বৃটিশ বুর্জোয়া ও হিন্দু বুর্জোয়াদের সম্পর্কটা ছিল কতোকটা কলেজে পড়া ছেলে এবং তাঁর বৃদ্ধ বাবার সম্পর্কের মতো। নতুন ও পুরাতন দুইটি পুরুষের মধ্যে আছে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, বিদ্বেষ, অথচ পরস্পরকে রয়েছে পরস্পরের প্রয়োজন। উপমাটা, অবশ্য, নির্ভুল হবে, যদি আমরা স্নেহের বদলে শোষণ বস্তুটাকে ধ'রে নিই।

হিন্দু-বুর্জোয়াদের অনিবার্য অভ্যুত্থানের দিকটাকে বৃটিশ বুর্জোয়ারা যখনই লক্ষ্য করলো, তখনই তারা বুঝলো এই নব জাগ্রত হিন্দু বুর্জোয়ারা যেদিন স্বাধীনতা, অর্থাৎ আপনাদের ধনতান্ত্রিক পক্ষ বিস্তারের জন্যে অবাধ আকাশ দাবী করবে, সেদিন যে সংগ্রাম সংঘর্ষ বাধবে, তাতে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের ঘটবে বিলোপ, ভারতে বৃটিশের পুঞ্জিত পুঁজির হবে অবসান ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা চিরদিন যে নীতির অনুসরণ ক'রে এসেছে ভারতেও তারা বিশদভাবে তার প্রয়োগের চেষ্টা করলো। এবং এই নীতি হোলো "ভেদ-ও শাসনের" নীতি। ভারতে বৃটিশ পুঁজিতন্ত্রের পরমায়ু দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছায় তারা হিন্দুদের ছেড়ে তোষণ সুরু করলো ভারতী মুসলমানদের। হিন্দু বুর্জোয়াদের পানে ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভারতে এক মসলেম ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে যে তরুণ মুসলম সম্প্রদায়, তারা বৃটিশের এই কৃপা-কটাক্ষকে গ্রহণ করলো সাদরে সতৃষ্ণ ভাবে। এমনিভাবে শুরু হোলো বৃটিশ সাম্রাজ্যের সুয়োরাণী হবার জন্যে মুসলমানদের অদম্য চেষ্টা। মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশের এই রাজভক্তির জন্যে বৃটিশরা ঋণী হোলো সার সৈয়দের কাছেই। সার ভ্যালেন্টীন চিরলের ভাষায়ঃ

"So great and enduring was the hold of Sir Syed Ahmed's teachings upon the progressive elements in

Mohomedan India that the All India Muslim League was founded in 1905 almost avowedly in opposition to the subversive activities which the Indian National Congress was beginning to develop."

অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দানকে একদা অস্বীকার ক'রে মুসলমান ভারত যে ভুল ক'রেছিল, আজ তাকে ভারতীয় হিন্দু বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বৃটিশ বুর্জোয়াদের সহায়তা ক'রে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হোলো, যে প্রায়শ্চিত্তের জন্যে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হোলো সমগ্র স্বাধীনতাকামী ভারতকে।

সার সৈয়দ আহমদ খানের আহ্বান অনুসারে বৃটিশ শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহারকে সাদরে সানন্দে বরণ করলো তখনকার নব-জাগ্রত মুসলমান সমাজ। কিন্তু এই বৃটিশ-প্রীতির ঢেউ আবুল কালামের পিতা মওলানা খইরুদ্দিনের গৃহপ্রাকারের বাইরে এসে ব্যাহত হোলো, তাঁর বসবার ঘর পরিণত হোলো না ড্রইং রুমে, বিলাতী ফ্যাশানের আসবাবের হোলো না আমদানি, পোশাক-পরিচ্ছদেরও হোলো না বিকৃতি বা বিবর্তন। মেঝেতে মাদুর মেলে রচিত হোতো তাঁর প্রাত্যহিক বসবার আসন। বিভবহীন রইতো গৃহের কক্ষগুলি। এই রিক্ত মাদুরের আসনেই নিয়মিত এসে বসতেন টিপু সুলতানের পুত্র, তথা দেশের শ্রেষ্ঠ বিত্তবান ব্যক্তিরা, বিনা দ্বিধায়, বিনা অবজ্ঞায়, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায়।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উচিত যে, মওলানা খইরুদ্দিনের গৃহে যে সকল শিষ্যের আগমন হোতো, তাঁরা সকলেই মুসলমান ছিলেন না। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দুও তাঁর কাছে ধর্ম সংক্রান্ত উপদেশ-আলোচনা শোনার জন্যে নিয়মিত আসতেন। এই ব্যাপারটি অতি বাল্যকালেই

ভাবীকালের হিন্দু মসলেম মৈত্রীর বাণী-বাহক আবুল কালামকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে।

একটি আড়ম্বরহীন রুচির ঋদ্ধিতে ভরে থাকতো মওলানা খইরুদ্দিনের গৃহের সমগ্র পরিবেশটি। পরিচ্ছদের দিক থেকেও আবুল কালামের পিতামাতা উভয়েরই ছিল এই সুরুচি এবং সম্ভ্রম। মা যেমন সাজসজ্জা, ও আভরণ-অলংকরণের পক্ষপাতী ছিলেন না, তেমনি বাবাও ছিলেন পরিচ্ছদের ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী,—উদাসীন। তাঁর বিখ্যাত পুত্র বলেন: "আমি বাবাকে বোতামওয়ালা জামা পরতে কখনো দেখি নি।" নবাগত ফ্যাশানের মতোই নবাগত ইংরেজি শিক্ষাকেও মওলানা খইরুদ্দিন বরদাস্ত করলেন না। তাই তাঁর দুই পুত্রের জন্যেই তিনি প্রাচীনপন্থী শিক্ষার করলেন ব্যবস্থা। তবে আবুল কালামের প্রতিভার পরিচয় অতি বাল্যকালেই তাঁর পিতা যথেষ্ট পরিমাণে পান। তাই তিনি আবুল কালাম একজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত হোন এই বাসনায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তাঁকে মিশরের আল আজ্‌হর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্যে পাঠান। সেখানে কাইরোতে মওলানা আজাদ দুই বৎসরের জন্যে অবস্থান করেন, এবং ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এর দুই বৎসর বাদে ১৯০৯ খৃস্টাব্দে মওলানা খইরুদ্দিনের মৃত্যু হয়।

অতি অল্প বয়সেই (আবুল কালামের বয়স তখন মাত্র ১৯ বৎসর) ইসলামিক সাহিত্য, দর্শন, ধর্মবিজ্ঞান ও ইতিহাস-সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত ব'লে আবুল কালাম পরিচিত হ'লেন। কিন্তু তবু তিনি বুঝলেন, যে-ইংরেজি শিক্ষাকে পিতার উপদেশ মতো সাবধানে সন্তর্পণে তিনি এড়িয়ে

গেছেন, আধুনিক কালকে, আধুনিক কালের চিন্তাকে, চেষ্টাকে, সত্যকে, সভ্যতাকে বুঝতে হ'লে সেই ইংরেজি শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। তাই অচিরেই আবুল কালাম তাঁর এক বন্ধুর সাহায্যে ইংরেজি ভাষায় পাঠ নিতে লাগলেন। অন্যান্য ভাষার মতোই ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর অধিকার জন্মালো অতি অল্প কালের মধ্যেই। শেক্‌সপীয়র, ওঅর্ডস্বার্থ ও শেলীর সমস্ত রচনা তিনি শ্রদ্ধাভরে পাঠ করলেন। পাঠ করলেন বাইরণের সমস্ত রচনা। ইংরেজি সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে বাইরণকেই তাঁর সব চেয়ে বেশি ভালো লাগে। তার কারণটা বোধ হয় কাব্যের মধ্যে নিহিত নেই, আছে তাঁর স্বাধীনতা-প্রীতির মধ্যে। যে কবি একদা অন্যদেশের স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছিলেন, স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা মওলানা আবুল কালাম আজাদের কাছে তাঁর চেয়ে প্রিয়তর কবি আর কে হ'তে পারেন? যদিও মওলানা সাহেব কদাচিৎ কখনো ইংরেজিতে কথা বলেন, তবু তাঁর স্বকীয় গ্রন্থাগারের আলমারিগুলি ইংরেজি ও ফরাসী গ্রন্থে থাকে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই তাঁর গ্রন্থাগারে সসম্মানে স্থান পেয়েছেন—গ্যেটে, স্পিনোজা, রুশো, মার্ক্স, হ্যাভ্‌লক্‌ এলিস, ডুমা, হিউগো, ডিকেন্স, টলস্টয়, রাস্কিন, কারলাইল। বিশেষ ক'রে ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস বা ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো রচনা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এখানেও তাঁর বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সব চেয়ে বড়ো কথা, জ্ঞানের ব্যাপারে তাঁর কোনো ছুৎমার্গ বা কুসংস্কার ছিল না। মহম্মদের জীবনী ও মাদাম বোভারি তিনি একই সংগে পড়েন। ইংরেজি ও ফরাসী গ্রন্থাদি ছাড়া তাঁর গ্রন্থাগারে যে প্রচুর আরবিক, পারসিক ও তুর্কী সাহিত্যের বহু গ্রন্থ আছে, তা বলাই বাহুল্য। তবে একথা বলা বাহুল্য হবে না যে, তিনি হিন্দু দর্শন ও ধর্ম-

শাস্ত্রেও গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। বেদ, উপনিষদ এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শন গ্রন্থগুলি তাঁর জীবনে অত্যন্ত প্রিয় বস্তু।

এমনি ভাবে দেশ ও বিদেশ, অতীত ও বর্তমান, সকল দেশের ও সকল কালের ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শন পাঠের ফলে জ্ঞানের প্রতি একটি অসংকীর্ণ নিষ্ঠা গড়ে ওঠে মওলানা আজাদের মধ্যে। তিনি প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন, কিন্তু নিষ্কৃতি পান জ্ঞানের গোঁড়ামির হাত থেকে।

বাল্যকালে ইংরেজি শিক্ষা থেকে তাঁর পিতা তাঁকে বঞ্চিত ক'রেছিলেন ব'লে তিনি তাঁর ওপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ করেন না, বরং জানান কৃতজ্ঞতা। মহাত্মাজী বলেছিলেন, ইংরেজি ভাষা তাঁকে মাতৃভাষার ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত করেছে। বাল্যে মাতৃভাষা ও পরবর্তীকালে বিদেশী ভাষা শিক্ষার ফলে মওলানা আজাদের অনুরূপ অনুযোগের কোনো কারণ ঘটে নি। মওলানা বলেন, তিনি যেভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন, তার ফলে তাঁর জীবনের অনেক মূল্যবান সময় অপব্যয়ের কঠিন হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তিন

পৃথিবীর অন্যান্য বহু শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর হাতে-খড়ি হয় সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই। বিপ্লবাত্মক কর্মের পূর্বেই বিপ্লবাত্মক চিন্তার জন্ম হয়ে থাকে সকল বিপ্লবীর মনে। মওলানা আজাদের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হোলো না। তাই বিপ্লবাত্মক কর্মের আগেই বিপ্লব শুরু হোলো তাঁর চিন্তার জগতে।

মওলানা আবুল কালামের বিশ বছর বয়স হবার আগেই তিনি কয়েকটি সাময়িক ও সাহিত্য পত্রিকার জন্মদাতা হলেন। অতি অল্প বয়স থেকেই আবুল কালাম অন্যান্য বহু শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর মতোই কবিতায় হাত পাকাতেন। কেবল কবিতায় হাত পাকিয়েই ক্ষান্ত হলেন না তিনি, কবিতা সংক্রান্ত একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করলেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'নিরংগি আলম'। এই নিরংগি আলম কবিতা পত্রিকায় তখনকার উর্দু সাহিত্যের সকল উদীয়মান কবিই নিয়মিত ভাবে লিখতেন। বাল্যকাল থেকেই আবুল কালামের কাব্য শক্তি ছিল যেমন অসাধারণ, কবিতা সম্পর্কে উদ্যমও ছিল তাঁর তেমনি প্রচুর। তাই নিজে কবিতা রচনা ক'রে বা অপরের কবিতাকে নিজের প্রকাশিত পত্রিকায় লালন ক'রে কবি আবুল কালামের কাব্যরতির শেষ হোতো না। তখনকার দিনে কবির লড়াইএর ছিল চল। এই কবির লড়াইগুলিতেও বালক কবি আবুল কালাম অংশ গ্রহণ করতেন সগৌরবে। কলিকাতার দক্ষিণে গার্ডেন রিচের আশে পাশে একটি স্থানে নিয়মিতভাবে এমনি কবির লড়াই হোতো। এই লড়াই-এ উদীয়মান থেকে অস্তমান প্রায় সকল স্থানীয় উর্দু কবিই অংশ গ্রহণ করতেন। কবির লড়াই-এ প্রথা ছিল দু কলি

কবিতা ঘোষণা করার। পরে এই ঘোষিত কবিতা-কলির পাদপূরণের জন্যে, কেবল পাদপূরণ নয়, অনেক সময় বাকী ছত্রগুলির রচনার জন্যে— ডাক পড়তো কবিদের। এই কাব্যকুস্তির আখড়ায় প্রতিবারেই বালক কবি আবুল কালাম যে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন, তা সবার কাছে বিস্ময়কর মনে হোতো। অনেকে সন্দেহ করতে লাগলেন, আবুল কালাম সবাইকে ঠকাচ্ছেন, হয় তিনি অন্য কোনো কবির রচনা থেকে চুরি ক'রে মুখস্থ বলছেন, নয় কোনো প্রবীণ কবি এখানে উপস্থিত কবিদের অপমান অপদস্থ করার জন্যেই এই বালককে তাঁর মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই কবিদের মজলিসে আসতেন নাদির খান নামে একজন প্রবীন উর্দু কবি। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কবি গালিবের শিষ্য। তাঁর মনেও আবুল কালাম সম্পর্কে এমনি একটি সংশয় বদ্ধমূল হ'য়ে উঠলো।

একদিন নাদির খান একটি রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দেখলেন, একটি বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে তরুণ আবুল কালাম কতকগুলি বই নেড়ে চেড়ে দেখছেন। নাদির খান ভাবলেন, ছোকরাকে জব্দ করার এই সুবর্ণ সুযোগ। তিনি আবুল কালামকে ডেকে বললেন, 'ওহে ছোক্‌রা, তুমি আমাদের মজলিসে দেখি তো কবিতা ছত্রের পর ছত্র অনর্গল ব'লে যাও। এখন আমি তোমায় এক কলি কবিতা বলছি। সেটি নিয়ে তুমি কই একটি কবিতা বানাও দেখি। যদি পারো, বলবো হ্যাঁ, তুমি কবি। নইলে জানবো, ওগুলো সব তোমার ধারকরা বুলি, ধাপ্পাবাজী।'

এমনিভাবে অকস্মাৎ অপমানিত আক্রান্ত হবার কথা কোনোদিন কল্পনাও করেন নি আজাদ। তিনি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু তবু প্রতিপক্ষের আহ্বানকে গ্রহণ না ক'রে পারলেন না।

নাদির খান বললেন: 'ধরো এই একটি কলি:

ইয়াদ না হো, শাদ না হো, আবাদ না হো······

বলোতো বাকী ছত্রগুলো।'

আবুল কালাম নিজের রোষটাকে কোনোক্রমে দমন ক'রে তাঁর কবিতার বল্গা আলগা ক'রে দিলেন। স্রোতের মতো বইতে লাগলো অবিরাম ছন্দিত শব্দের প্রবাহ। নাদির খান বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেলেন। মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন, 'একী করেছেন তিনি। এক ক্ষণজন্মা কবিকে অপমান ক'রে বসেছেন!'

বৃদ্ধ নাদির খান আনন্দে অনুশোচনায় অধীর হ'য়ে উঠলেন। ভুলে গেলেন পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সদর রাস্তার যানবাহন, লোক-চলাচল বাজারের কল-কোলাহল। তিনি উল্লাসে উন্মাদ হ'য়ে গেলেন। বালক আবুল কালামকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে চীৎকার করতে লাগলেন, শোভনাল্লা! শোভনাল্লা!

পথের জনতা হয়তো এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে মুহূর্তের জন্যে থামলো, হয়তো থামলো না। কিন্তু কেউ তারা সেদিন জানলো না, যে-বালকটিকে নিয়ে এই বৃদ্ধের এতো কোলাকুলি, এতো নাচানাচি, তিনিই একদা ভারতের অন্যতম ভাগ্যনিয়ন্তা আবুল কালাম আজাদ।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আবুল কালামের অধুনা বিখ্যাত 'আজাদ' নামটি এই কাব্য-সাধনার যুগ থেকেই কালের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে বর্তমান পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। 'আজাদ' এই ছদ্ম নামেই আবুল কালাম একদা কবিতা লিখতেন।

কিন্তু এর চেয়েও একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল আজাদের বাল্য-জীবনে। আজাদের বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। আজাদ তাঁর প্রথম সাময়িক পত্র 'লিসানস সিদিক' বা সত্যের বাণী প্রকাশ ক'রেছেন। আবুল কালাম

বয়সে তরুণ হ'লেও জ্ঞানে ছিলেন বৃদ্ধ। প্রায় সকল বিষয়েই ছিল তাঁর সমান অধিকার—কি ইতিহাসে, কি দর্শনে, কি কাব্য সাহিত্যে। সকল বিষয়েই ছিল তাঁর সুগঠিত সুচিন্তিত মতামত। এবং এই মতামতগুলি তিনি প্রকাশ করতেন তীক্ষ্ণ তির্যক ভাষায়, যা পাঠকের মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী না হ'য়ে পারতো না।

এই সময় উর্দু সাহিত্যের অন্যতম সেরা পণ্ডিত ও কবি খাজা আলতাফ হোসেন হালি সার সৈয়দ আহ্‌মদ খানের একটি জীবনী রচনা করেন। এই পুস্তকখানির পুংখানুপুংখ সমালোচনা করার দুঃসাহস বা স্পর্ধা প্রায় কারো ছিল না। কিন্তু সে দুঃসাহস ও স্পর্ধা হোলো চতুর্দশবর্ষীয় এক বালকের। আবুল কালাম তাঁর 'লিসানুস সিদিক' পত্রিকায় এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ও সুগভীর একটি সমালোচনা করলেন। এই সমালোচনা সমস্ত উর্দু সাহিত্যিকদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আবুল কালাম যে জ্ঞান-বৃদ্ধ কোনো মহাজন, এ-বিষয়ে কারো সংশয় রইলো না। আবুল কালামের রচনার সংগে সে-যুগের সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের সুপরিচয় থাকলে-ও, তাঁর সংগে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না কারো। ফলে 'আন্‌জুমান-ই-হিমায়ৎ-ইসলাম' সংঘের ১৯০৪ সালের বার্ষিক অধিবেশনে অভিভাষণ দেওয়ার জন্যে ডাক পড়লো 'লিসানুস সিদিক' পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদকের।

তদানীন্তন উর্দু সাহিত্যের সমস্ত দিকপালরাই উপস্থিত ছিলেন এই সভায়। প্রধান তিন জন হলেন: কবি হালি—যাঁর লেখা সার সৈয়দ আহমদের জীবনী সম্পর্কে সমালোচনা করেছিলেন আজাদ; উর্দু সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক নাজির আহমদ; এবং সুবিখ্যাত উর্দু কবি শেখ মহম্মদ ইকবাল। অভিভাষণের বিষয় ছিল: 'ধর্মের বুদ্ধি-ভিত্তি।'

নির্দিষ্ট সময়ে বক্তার আসনে এসে দাঁড়ালেন চতুর্দশবর্ষীয় বালক আবুল

কালাম। কিন্তু এই বালককে এই বক্তৃতামঞ্চে কেউ আশা করেন নি। কবি হালি তো ভেবে বসলেন, এই বালক নিশ্চয় মহা পণ্ডিত আবুল কালামের কিশোর পুত্র; পিতার অসুস্থতা কিম্বা অন্য কোনো কারণে পিতার লিখিত অভিভাষণ সংগে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু যখন আবুল কালামকে সভাস্থ সকলের সংগে পরিচিত ক'রে দেওয়া হোলো তখন সকলে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু এর চেয়ে-ও বৃহত্তর বিস্ময় তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে বিস্ময় তাঁর অতুলনীয় বক্তব্য এবং বাচনভংগী। ঐ দিনের ঐ ঘটনা ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজে অপূর্ব এক আবির্ভাব ঘোষণা ক'রে দিলো। সমগ্র উর্দু ভাষাভাষী সমাজ সেদিন এই বালক প্রতিভার ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ নেত্রে। কবে এই মহাপুরুষ তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়াবেন!

সেদিন কবি হালি এই বালককে "নবীন স্কন্ধে প্রবীন মস্তিষ্ক" ব'লে বর্ণনা ক'রেছিলেন।

এই প্রসংগে আমাদের মনে রাখা দরকার, ভারতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হ'তে তখনো এক বৎসর বাকী। তখনো আবুল কালাম আল্ আজ্হর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্যে যান নি। তখনো ইংরেজি সাহিত্যের মূল্যবান সংস্পর্শ থেকে তিনি বঞ্চিত।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে আবুল কালাম যখন মিশর থেকে ভারতে ফিরলেন, তখন কেবল জ্ঞানের ও কাব্যের সাধনাই তাঁর জীবনের অপরিমিত প্রাণ-শক্তিকে ক্ষয় করতে পারলো না। একটি বিরাট সুদূরপ্রসারী কোনো কর্মের প্রেরণা,—যার মধ্যে ধৈর্য আছে, ত্যাগ আছে, মহিমা আছে—তাঁর সমস্ত সত্তাকে নিরন্তর পীড়িত করতে লাগলো। কিন্তু কী এই কর্ম?

আবুল কালাম ব্যস্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ন্ত বয়সের দুরন্ত মুহূর্তগুলি একটি মহান আদর্শের জন্যে অন্তরের সমস্ত কামনা দিয়ে কাতর হ'য়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলো। কিন্তু তবু সেই মহান্ কর্মের, বিরাট আদর্শের সন্ধান তিনি পেলেন না। আবুল কালামের কাছে মাঝে মাঝে বেঁচে থাকাটা-ও যেন মনে হোলো নিরর্থক। শুধু জানায়, কেবল কল্পনায়-ই কি জীবনের সার্থকতা? আবুল কামালের কাছে তাঁর জীবন মাঝে মাঝে মনে হোলো দুর্বহ। কখনো কখনো আত্মহত্যার কথা-ও তিনি ভাবলেন।

এই সময় উনিশ বৎসর বয়সে আবুল কালাম ইরাক, সিরিয়া ও মিশর পর্যটন ক'রে দেশে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন, সমগ্র দেশে এক কর্মের আহ্বান এসেছে। বংগ-ভংগের আঘাতে জেগে উঠেছে সমস্ত ঘুমন্ত বাংলা। সময় এসেছে সকল শক্তি দিয়ে বৃটিশ শাসকদের আঘাত দেওয়ার। অকস্মাৎ আবুল কালাম তাঁর বহু অপেক্ষিত আদর্শের সন্ধান পেয়ে গেলেন। তাঁর দুর্বার যৌবনের সমস্ত প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলেন এই দেশব্যাপী মহা কর্ম-স্রোতের তরংগে। তিনি যেন বেঁচে গেলেন। সন্ধান পেলেন জীবনের লক্ষ্যের, আদর্শের, কর্মের। জ্ঞানই আবুল কালামের জীবন-সংগীতের মূল সুর নয়। তাঁর জীবন-সংগীতের মূল সুর কর্ম। তিনি কেবল জ্ঞান-যোগী নন, কর্ম-যোগী। আবুল কালাম তন্ত্রাসবাদীদের সংগে মেলামেশা করতে লাগলেন। ফলে ভারত সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের দৃষ্টিটা তাঁর ওপর এসে পড়লো অনিবার্যভাবে।

কিন্তু এই কর্ম-ব্যস্ততায় আত্মনিয়োগ করা সত্ত্বেও তাঁর মন এবং মস্তিষ্ক সংশয়ের হাত থেকে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পেলো না। একটি দুর্বোধ্য দ্বন্দ্ব, একটি আপাত অসামঞ্জস্য মাঝে মাঝে তাঁকে ব্যাকুল ক'রে তুলতে লাগলো। এই

দ্বন্দ্ব নূতনের সংগে পুরাতনের, ইসলাম সভ্যতার সংগে বৃটিশ সভ্যতার, বৃটিশের প্রতি শপথগ্রহী অনানুগত্যের সংগে বৃটিশের প্রতি সার সৈয়দ প্রবর্তিত অকুণ্ঠ সহযোগিতার। যে-সংসারের ও সংস্কৃতির পরিবেশের মধ্যে আবুল কালাম মানুষ হয়েছিলেন, পুরাতন ছিল সেখানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নূতনের প্রবেশ ছিল সেখানে নিষিদ্ধ। ইসলাম সভ্যতাই ছিল সেখানে পৃথিবীর সেরা সভ্যতা, তার সংস্কৃতি পৃথিবীর যে কোন জাতির পক্ষেই ছিল ঈর্ষার বস্তু। সেখানে বৃটিশ ছিল ভারতীয় মসলেমের প্রবল শত্রু—বৃটিশই বঞ্চিত করেছিল ভারতীয় মসলেমকে তার স্বাধিকার থেকে। কিন্তু ঠিক এই সময়েই দেশময় মুসলমান সমাজের মধ্যে যে-নূতনের প্রবল বন্যা এলো, তা এই পরিবেশের সম্পূর্ণ বিপরীত। সার সৈয়দ চাইলেন দেশে নূতন শিক্ষা-দীক্ষার প্রবর্তন করতে, তাঁর চোখে বৃটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কাছে ভারতীয় প্রাচীনপন্থী ইসলামিক সভ্যতা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। বৃটেনের নাকি ন্যায্য কারণ রইলো ভারতীয়-দিগকে বুদ্ধিহীন পশু ব'লে ভাববার। সার সৈয়দের প্রচারের ফলস্বরূপ ১৯০৫ সালে যে-মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হোলো তাতে গ্রহণ করা হোলো ভারতীয় মুসলমানদের শপথগ্রহী শত্রু ইংরেজদের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুরূপে। এবং যে-হিন্দুদের সংগে ভারতীয় মুসলমানদের মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সমস্ত মুসলমান মনীষীরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে গেছেন, তাদের-ই প্রকারান্তরে ঘোষণা করা হোলো প্রতিযোগীরূপে। ফলে যে শিক্ষা-দীক্ষা ও ঐতিহ্যের ওপর আবুল কালামের জীবনাদর্শের ভিত্তি একদা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল নূতন মতবাদের সংগে তার কোন সামঞ্জস্য সমন্বয় তিনি খুঁজে পেলেন না। বর্তমানকে অস্বীকার ক'রে পুরাতনকে মেনে নেওয়া হোলো সংকীর্ণ রক্ষণশীলতা। আবার অতীতকে অস্বীকার ক'রে বিনা দ্বিধায়

নূতনকে মেনে নেওয়া, সে-ও হোলো—নিজের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া।

আবুল কালাম চাইলেন এই দ্বিধার মধ্যে, দ্বন্দ্বের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য খুঁজে বার করতে। তিনি আবার সমগ্র কোরাণ সতর্কভাবে পাঠ করলেন, প্রতিটি বাণীকে বর্তমানের আলোকে, যুক্তিতে দেখলেন যাচাই ক'রে। তাঁর সংশয় দূরীভূত হোলো। দেখলেন, পাশ্চাত্য চিন্তা ও জ্ঞানের সংগে ইসলামিক চিন্তার ও জ্ঞানের বিন্দুমাত্র-ও পার্থক্য নেই। পুরাতন জন্ম দিয়েছে আজকের নূতনকে। তাই পুরাতনকে অস্বীকার ক'রে কেবল নূতনকে নিয়ে মেতে ওঠা, সে-ও অন্যায়। কেবল অন্যায় নয়, মূঢ় অমানুষিকতা—পিতৃদ্রোহী পুত্রের স্বেচ্ছাচারের মতো। অপরপক্ষে, নূতনকে অস্বীকার ক'রে কেবল পুরাতনকে নিয়ে যক্ষের মতো জেগে থাকা তা-ও ভুল। নিজের ক্ষুধিত শিশু-সন্তানকে স্তন্য থেকে বঞ্চিত ক'রে মৃত বৃদ্ধ পিতার কবরের পাশে ব'সে কোনো বুদ্ধিহীনা নারীর ব্যর্থ রোদনের মতো।

মওলানা আবুল কালাম কোরাণের যে-তর্জমা করেন, তার মুখপত্রে তিনি বলেন: "আধুনিক কালের পণ্ডিত এবং সমালোচকগণের মধ্যে একটি সুপ্রচলিত রীতি হইল এই যে তাঁহারা পুরাতন এবং নূতনকে পৃথক করিয়া দেখেন। কিন্তু আমি এইরূপ কোনো পার্থক্য স্বীকার করি না। পুরাতনকে আমি পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকাররূপে পাইয়াছি এবং বর্তমানকে আমি রচনা করিতেছি স্বহস্তে। অতীতের সকল দিকের সহিত আমার যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে, আধুনিক কালের সকল চিন্তার ধারার সহিত তেমনি আমার পরিচয় রহিয়াছে সুস্পষ্ট।"

এইরূপে অতীত এবং বর্তমান বা পুরাতন ও নূতনের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ

পরিচয় হওয়ায় তিনি সে-দুটির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত গভীর যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন। বুঝলেন, কাল থেকে কালে এই সংক্রান্তি, এর ছেদ নেই, এর কোনো ভেদ নেই। এ-টি সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন। তাই সার সৈয়দের নেতৃত্বে আলিগড়ে যে উগ্র আধুনিকদের একটি দল গ'ড়ে উঠেছিল এবং মুসলমান সমাজকে অতি মাত্রায় প্রভাবান্বিত করেছিল,তার সংগে তাঁর চিন্তার ও রীতির ঘটলো বিরোধ। তিনি নূতন ও পুরাতনকে গ্রহণ করলেন তার বিরোধের মধ্য দিয়ে নয়—তার বিরোধের অন্তরালে যে সমন্বয়ের সূত্রটি রয়েছে, তাকেই অবলম্বন ক'রে। ইংরেজি ভাষা ও আদব-কায়দার প্রতি তাঁর যেমন কোনো বিদ্বেষ রইলো না, তেমনি রইলো না সেগুলিকে নিয়ে মাতামাতি করার অন্ধতা। অর্থাৎ, তথাকথিত কুসংস্কারকে ধ্বংস করার কুসংস্কার আবার তাঁকে পেয়ে বসলো না। সার সৈয়দের চেলারা যখন বললো, পা আগে ফেলে আমরা এগিয়ে চলবো, আবুল কালাম তখন বললেন, পা আগে ফেলার জন্যে পেছনের পাটির উপর ভর দেওয়া যেমন সম্পূর্ণ দরকার, তেমনি পেছনের পাটি না তুলে-ও এক পা এগোনো একেবারে অসম্ভব। সুতরাং দুই পায়ের দিকেই নজর দাও।

তাই আলিগড়পন্থীরা নিজেদের প্রগতিপন্থী ব'লে জাহির করলেও, তাঁরা সত্যিকারের প্রগতিপন্থী ছিলেন না। কারণ, তাঁরা গতির রীতিটা আয়ত্ত করতে পারেন নি। যে-ঠ্যাংটা আগে পড়লো, তাকেই যারা একম্. অদ্বিতীয়ম্ ব'লে ধ'রে নিলো এবং পেছনের ঠ্যাংটাকে করলো বেকদর, তারা এগুবে কেমন ক'রে? তাদের প্রগতি দুর্গতির-ই তো নামান্তর!

ফলে মওলানা আবুল কালামের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত সুচিন্তিত মতামত গ'ড়ে উঠলো—আলিগড়ীদের সংগে যার রইলো প্রচুর ব্যবধান, অনেক ক্ষেত্রে চরম বিরোধ। তিনি জানালেন:

প্রথমত, বৃটিশ সভ্যতার আমদানির দরকার আছে। কিন্তু সেই সংগে একথাও মনে রাখতে হবে, ইসলামিক সভ্যতার পলিমাটিতে বৃটিশ সভ্যতার সেচের প্রয়োজন, তার বন্যার নয়। সেচের নামে যারা বাঁধ ভেঙে বন্যা আনতে চাইলো, আবুল কালাম তাদের বাঁধতে চাইলেন নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, বৃটিশের সংগে আলিগড়ীদের হিন্দু-বিরোধী সহযোগিতা আত্মঘাতেরই অন্য নাম। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই মুসলমান জনসাধারণের শত্রু,—হিন্দুরা নন।

এই দুটি বিষয়কে ভালোভাবে মনে রাখলেই মওলানা আবুল কালামের সমস্ত চিন্তা ও কর্মধারাকে হৃদয়ংগম করা সহজ হবে। তাঁর যুক্তিবাদিতার মধ্যেই তাঁর নির্ভীক বৃটিশ-বিরোধিতা এবং অকুণ্ঠ হিন্দু-প্রীতির উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে, একথা আমাদের মুহূর্তের জন্যে-ও ভুললে চলবে না।

চার

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভেদ ও শাসনের চিরাচরিত রীতিটিকে সার সৈয়দ ও তাঁর আলিগড়ী বন্ধুরা বুঝতে না পারলে-ও তরুণ আবুল কালামের চোখে তার স্পষ্ট রূপটি সহজেই ধরা পড়লো। তাই সার সৈয়দ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সোৎসাহে গ্রহণ করলে-ও, ভারতীয় মুসলমানেরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে ক্রীড়নক হ'য়ে ওঠে, এটুকু তিনি কোনো মতেই সইতে পারলেন না। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের তাদের ভ্রান্ত জননেতা এবং বৃটিশ চক্রান্তকারীদের কবল থেকে রক্ষা করা-ও সাধারণ ব্যাপার ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, মাত্র বিশ বৎসর বয়সেই তরুণ আবুল কালাম দেশব্যাপী এই ভ্রান্তির বিরুদ্ধে দুঃসাহসের সংগে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার গুরু দায়িত্ব নিজের স্কন্ধেই আরোপ করলেন। এই স্পর্ধা কেবল আবুল কালামেরই সাজে।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে যে-সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই অগ্নিদাহের উজ্জ্বল আলোকপ্রভায় বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীরা একটি জিনিষ আতংকের সংগে লক্ষ্য করল যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন নিবল। কিন্তু সেদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে জ্ঞান লাভ করলো, তা তারা মুহূর্তের জন্যেও ভুললো না। তারা বদ্ধ পরিকর হোলো হিন্দু ও মুসলমানকে পৃথক ক'রে রাখতে। এই ভেদের নীতি কার্যকরী করার জন্যে তারা হিন্দুদের যে-সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দিল, মুসলমানদের তা থেকে করলো বঞ্চিত। অর্থাৎ, যেমন আগে বলেছি, ভারতীয় হিন্দুদের দিল সুয়োরাণীর সোনার পাট। ফলে ভারতীয় হিন্দু সমাজ শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থসামর্থ্যে

মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রাপ্ত বয়স্ক হ'য়ে উঠলো। নানা সুযোগ সুবিধারও বলিষ্ঠ আত্মপ্রসারের জন্যে তারা শুরু করলে আন্দোলন। ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রীতির পাত্রান্তর ঘটলো এবং অগ্রগামী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ' রূপে ব্যবহার করার জন্যে নিরবধি চেষ্টা চলতে লাগলো। আর ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে খাড়া করবার জন্যে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন হোলো, ততক্ষণ বৃটিশ কূটনীতিকেরা তাঁদের সুঅভ্যস্ত মিষ্ট কথায় আন্দোলনকারীদের মৃদু উৎসাহ পর্যন্ত-ও দিতে লাগলেন। এমন কি কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে সরকারী গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রিত পর্যন্ত হ'তে থাকলেন। এই সরকারী সৌজন্যটা ছিল নিতান্ত কূটনৈতিক; হিন্দু আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে যে-সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেওয়া হবে—অর্থাৎ নব জাগ্রত মসলেম সম্প্রদায়কে—তাকে গ'ড়ে তোলার জন্যে কোনোক্রমে কালক্ষয় করা, এই মাত্র। লর্ড ডাফরিণ তাঁর সকল নৈপুণ্য দিয়ে এই কর্তব্য পালনে অগ্রসর হ'লেন। একদিকে তিনি নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের পিঠ চাপড়ে দিতে লাগলেন বাহবা, দিতে লাগলেন ভারতীয়দের রাজনীতিক আন্দোলন সম্পর্কে সতর্ক মৃদু সমর্থন এবং উৎসাহ, অন্যদিকে আবার এ-ও জানালেন যে: "ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ, যেখানে ইউরোপের অনুরূপ কোনো গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কার্যকরী করা যায় না।" কেবল তাই নয়, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান এবং তার আন্দোলন যে দেশের বিপুল জনসাধারণের আন্দোলন, তা-ও তিনি অস্বীকার ক'রে গেলেন। সর্বোপরি, তিনি এখানেই ক্ষান্ত হ'লেন না। তিনি বারে বারে ভারতের হিন্দু মুসলমান, এই দুই বিরাট সম্প্রদায় এবং তাঁদের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করতে লাগলেন। এই দুই জাতির জনসংখ্যা, জীবনযাত্রার রীতিনীতি, ধর্ম,

সামাজিক প্রথা, আদর্শ, আকাংখা, সমস্তর মধ্যেই তিনি নিরন্তর দেখতে লাগলেন এক বিরাট ব্যবধান। এমন কি একথাও কেউ কেউ (যেমন তদানীন্তন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লেফ্টেন্যান্ট গভর্ণর সার অকল্যাণ্ড কল্‌ভিন) বললেন, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান। স্থতরাং হিন্দুদের দ্বারা আরব্ধ কোনো আন্দোলনের অর্থ হোলো মুসলমান জনসাধারণকে সেই আন্দোলনের প্রতি-আন্দোলনের জন্যে উশ্‌কানি দেওয়া। তবে বৃটিশ শাসকরা সান্ত্বনার-ও সন্ধান পেলেন। লর্ড ডাফরিনের কথায়—'the Mahomedans have also certainly been brought much more into sympathy with the Government than they were before."

বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিকরা এই মহৎ কার্যের পুরোহিত রূপে গ্রহণ করলেন সার সৈয়দ আহ্‌মদ খানকে। সার সৈয়দ বৃটিশ রাজনীতিকদের কূটচক্রে প'ড়ে তাঁদের ব্যবহারে এলে-ও তিনি মসলেম সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যেই যে অকপটভাবে চেষ্টা করছিলেন, একথা-ও ব'লে রাখা উচিত। নইলে তাঁর ওপর অবিচার করা হবে। বৃটিশ সরকার সার সৈয়দের দলকে বৃটিশপ্রীতি এবং হিন্দু-বিরোধিতার কাজে লাগিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। মুসলমানরা যাতে আগা খানের নেতৃত্বে সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের দাবী ক'রে সরকারের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে, সেজন্যে-ও লর্ড মিণ্টো তাঁদের উশ্‌কানি দিতে লাগলেন। আবুল কালাম স্বয়ং বলেন যে সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবটা আলিগড় থেকে আসেনি। এসেছিল খাস সিমলা থেকেই। তখন আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন মিঃ আর্চিবল্ড। আলিগড় গোষ্ঠীর সংগে সিমলার রাজকীয় দপ্তরের যোগাযোগটা এঁর মারফৎই ঘটতো। স্থতরাং একদা লর্ড মিণ্টোর সংগে সাক্ষাৎকার শেষ ক'রে মিঃ আর্চিবল্ড আলিগড়ে ফিরে আলিগড় কলেজের

অনারারি সেক্রেটারি নবাব মহসিন-উল-মুলুক-কে এই সম্প্রদায়গত প্রতিনিধিত্বের সম্বন্ধে প্ররোচিত করলেন। আগা খান ইতিমধ্যেই বিলাতের পথে রওনা হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি আদেনে পৌছার পূর্বেই নবাব মহসিন-উল-মুলুকের জরুরি তার পেয়ে অবিলম্বে বোম্বাই-এ এসে পৌছলেন। মুসলমানদিগকে লর্ড মিণ্টোর গোপনে এই উশ্‌কানি দেওয়ার কাজটিকে মওলানা মহম্মদ আলি বলেছেন: "a command performance."

আবুল কালাম যখন তাঁর পাঠ শেষ ক'রে বিশ বৎসর বয়সে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন দেখলেন, ভারতে এমনিভাবে বৃটিশ চেষ্টার ফলে একটি সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রবলভাবে গ'ড়ে উঠেছে। কেবল তাই নয়, সেই সংগে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশের তাঁবেদারি করার একটি দুঃস্থ মনোবৃত্তি-ও! মুসলমানদের গোলামির এই মনোভাবটি আবুল কালামের কাছে আরো পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠলো, কারণ তিনি দেখলেন, যখন দেশের হিন্দু জনসাধারাণ দেশ-প্রেমের আদর্শে মেতে উঠেছে, তারা নিঃসংকোচে নির্ভয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঘা দিতে এগিয়ে এসেছে, তখন মুসলমান জনসাধারণ করছে বৃটিশের তোষণ, চাটুদারি, তাঁবেদারি, কৃপালোভী উঞ্ছবৃত্তি। এই মুসলমানরাই কি একদিন সিপাহী বিদ্রোহ করেছিল, করেছিল ওয়াহাবি আন্দোলন? সমগ্র মুসলমান সমাজের এই অধঃপতন আবুল কালামের কাছে অত্যন্ত দুঃসহ লাগলো। মুসলমান জনসাধারণকে তাদের আপন সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'লেন আবুল কালাম। কিন্তু কেমন ক'রে তা সম্ভব? আরো কয়েক বছর এ-বিষয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করলেন। দুটি ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হোলো। এজন্যে প্রয়োজন, প্রথমত আলিগড় গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। দ্বিতীয়ত, দীর্ঘকাল

প্ররোচনার ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে বৃটিশ অনুরাগের উদ্ভব হ'য়েছে, তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করা। এই উভয় কার্যের জন্যে আবুল কালাম প্রকাশ করলেন তাঁর সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা "বাঁকাচাঁদ" বা "আল্ হিলাল"।

আল্ হিলালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হোলো ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১লা জুন তারিখে। তখন মওলানার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। ইতিমধ্যেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে মওলানা (যার আক্ষরিক অর্থ হোলো নেতা) ব'লে গৃহীত হয়েছেন। আল্ হিলালের উদ্দেশ্য বৃটিশ তোষক আলিগড়পন্থীদের হাত থেকে ভারতীয় মুসলমানদের আপনার স্বাধীন সত্তায় ফিরিয়ে আনা হ'লেও মওলানা মহম্মদ আলি পর্যন্ত তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কমরেডে' এই শিশু ভয়ংকরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি কেবল যে এই পত্রিকার শক্তিশালী সম্পাদককে তাঁর মনীষার জন্যে প্রশংসা করলেন তাই নয়, এই পত্রিকার মুদ্রন, অংকন, গঠন সব কিছুই তাঁকে মুগ্ধ করলো। তবে, পত্রিকার নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে কোনো উল্লেখই তিনি করলেন না। কারণ, মওলানা মহম্মদ আলি তখন-ও পর্যন্ত আলিগড়পন্থীদেরই সমর্থক ছিলেন। কয়েকটি মাত্র সংখ্যা আল্ হিলাল প্রকাশের সংগে সংগে সমগ্র মুসলমান সমাজে তুমুল চাঞ্চল্য দেখা গেল। একথা স্থির হ'য়ে গেল যে, সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়ের আকাশে নূতন জ্যোতিষ্কের অভ্যুদয় ঘটেছে। কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন সার সৈয়দ। তরুণ মওলানা আজাদ জেহাদ ঘোষণা করলেন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে।

প্রকাশের সংগে সংগে আল্ হিলাল্ মুসলিম সমাজে যে কী প্রকারের অভ্যর্থনা পেয়েছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই ব্যাপারটি থেকে যে মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই এই পত্রিকার বিক্রয়ের সংখ্যা এগারো হাজারে

পৌঁছে। পত্রিকার বাৎসরিক চাঁদা ছিল ১২ টাকা। ভারতবর্ষের মতো গরিব দেশে এ নিতান্ত অল্প মূল্য নয়। এই ব্যাপারটি মনে রাখলে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা থেকে পত্রিকার গুরুত্বটা আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। কেবল তাই নয়, এই পত্রিকার গুরুত্ব সম্পর্কে আরো গুরুতর প্রমাণ এই যে, এই পত্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের নানা স্থানে নানা মহলে সংঘবদ্ধ আলোচনা ও আন্দোলন শুরু হোলো। বিশেষ ক'রে কলিকাতার উর্দু-ভাষাভাষী মহলে,—কারণ, আল্ হিলালের মার্জিত উর্দু বাংলা দেশের দু'একজন মাত্র ছাড়া অন্য সকলের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। সাহেবজাদা আফতার আহমদ খান প্রভৃতি অনেকেই এই পত্রিকার বিরুদ্ধে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ান। কিন্তু যুক্তপ্রদেশে আল্ হিলালের প্রভাব দ্রুত বাড়তে লাগলো। সেখানে এর জন-প্রিয়তা এমন হোলো যে এই পত্রিকা পাঠের জন্যেই বহু স্থানে বহু পাঠ-চক্র রচিত হোলো। যুক্তপ্রদেশে আল্ হিলালের এই বিশেষ প্রভাবের মূল কারণ সম্ভবত এর ভাষা—সুমার্জিত উর্দু ভাষার জন্মস্থান যুক্তপ্রদেশে এই ভাষার কদর না হ'য়ে উপায় ছিল না।

অনতিবিলম্বেই আল্ হিলাল পত্রিকার রাজনীতিক উদ্দেশ্য মুসলমান জনসমাজে সুপরিচিত হ'য়ে উঠলো। কেবল তাই নয়, মওলানা আবুল কালামের সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত মতামতগুলি সম্পর্কে-ও কারো কোনো সংশয় রইলো না—এই সমস্ত মতামত অনেক সময় মুসলমানদিগকে ব্যস্ত বিব্রত ক'রে তুললো। আল্ হিলাল প্রকাশের অল্প দিন বাদেই ১৯১৩ খৃস্টাব্দে অযোধ্যায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাংগা-হাংগামা বাধলো। হিন্দু মুসলমানের দাংগা-হাংগামার কারণ সচরাচর যা হ'য়ে থাকে, এবারে-ও ছিল তাই; গো-সেবা বনাম গোহত্যা। মওলানা সাহেব দুঃসাহস ও দৃঢ়তার সংগে তাঁর স্ব-সম্প্রদায়কে জানালেন, মুসলমানেরা গোহত্যার অধিকার দাবী ক'রে যদি

এইভাবে বিবাদ করতে থাকেন, তবে তা কখনো সাম্প্রদায়িক শান্তির অনুকূল হবে না। এইরূপ উদার সহিষ্ণু মতামত মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকের কাছে মওলানা সাহেবকে স্বজাতি-দ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী করতে যথেষ্ট ছিল। এমন কি, মওলানা সাহেবের অন্তরংগ বন্ধু হাকিম আজমল খান পর্যন্ত মওলানা সাহেবের এই অসংকীর্ণ শান্তির পথকে অযৌক্তিক ব'লে ঘোষণা করলেন। তাঁদের এই তিক্ত মতানৈক্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'য়েছিল। বহু দিন বাদে ১৯২০ সালে মাত্র হাকিম সাহেব নিজের ভ্রান্তি বুঝতে পারেন ও বিনা দ্বিধায় তিনি মওলানা সাহেবের কাছে নিজের ত্রুটি স্বীকার করেন এবং অতঃপর হিন্দু-মসলেম মৈত্রীর একনিষ্ঠ সাধক হ'য়ে ওঠেন। অন্যান্য অনেকের মতোই মওলানা মহম্মদ আলি-ও মওলানা সাহেবের নীতির তীব্র সমালোচক হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু এই শক্তিশালী সংঘবদ্ধ বিরোধিতা সত্ত্বে-ও পত্রিকার প্রভাব বিন্দু মাত্র খর্ব হোলো না। কেবল ভারতবর্ষে নয়, ভারতের বাইরে-ও তার শক্তি এবং প্রতিপত্তি অনুভূত হ'তে লাগলো।

সার সৈয়দের অনুরক্ত ভক্ত আলিগড়পন্থীদের কাছ থেকে যতোই বিরোধিতা আসুক না কেন, তরুণ মুসলমান সম্প্রদায় আল্ হিলালের বাণীর দিকেই কান পেতে রইলো। কারণ, সার সৈয়দের রীতির মধ্যে তারা তাদের বর্তমান সমস্যার কোনো সমাধান দেখলো না। বস্তুত, সার সৈয়দের সময়ের মুসলমান সম্প্রদায়ের যে-সমস্যা ছিল, ছিল যে-অভাব অভিযোগ, সে-সামাজিক সমস্যা অভাব-অভিযোগ ছিল না মওলানা আবুল কালামের সমসাময়িকদের। সার সৈয়দ চেষ্টা করছিলেন একটি মুসলমান বুর্জোয়া শ্রেণী গ'ড়ে তুলতে। সে জন্যে তাঁর প্রয়োজন ছিল বৃটিশ বুর্জোয়াদের সাহায্য। কিন্তু প্রায় দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী পরে মুসলমানের মধ্যে এখন একটি মধ্যবিত্ত সমাজ গ'ড়ে উঠেছে। এখন আর তাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে

বৃটিশের সাহায্যের প্রয়োজন নেই। আজ তাদের প্রয়োজন ভারতের আকাশে নিজেদের পত্রপল্লব বিস্তারের জন্যে অবারিত অবকাশ। আর এই অবকাশকে ব্যাহত করেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা। সুতরাং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে তাদের সংঘর্ষ আজ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো, ঠিক যেমনটি হ'য়ে উঠেছিল নবজাগ্রত হিন্দুদের বেলায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। হিন্দু বুর্জোয়াদের সংগে বৃটিশ বুর্জোয়াদের সে সংগ্রাম-সংঘর্ষের এখনো শেষ হয় নি। সুতরাং,এ-সময় বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে বিলাতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে হিন্দু বুর্জোয়াদের পাশে এসে দাঁড়ানোই ছিল নবজাগ্রত মুসলমান বুর্জোয়াদের একমাত্র পথ। কারণ, উভয়েরই লক্ষ্য ছিল এক—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত ক'রে সেখানে আপনাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত করা। সুতরাং আল্ হিলালের বাণীই—অর্থাৎ বৃটিশ বিরোধী হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বাণীই—হ'য়ে উঠলো তখনকার মুসলমান ভারতের একমাত্র কার্যকরী আদর্শ। ফলে ভারতীয় মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণপথ ছেড়ে আসতে লাগলেন হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রশস্ত রাজপথে। এমন কি, মুসলীম লীগের লণ্ডন শাখা পর্যন্ত ঘোষণা ক'রে বসলেন যে হিন্দুদের সংগেই এক সাথে মুসলমান-জনসাধারণকেও তাদের ভাগ্যের বাজী ধরতে হবে। কিন্তু তরুণদের এই নূতন দৃষ্টিভংগীকে মওলানা মহম্মদ আলির মতো প্রধান প্রধান আলিগড়পন্থীরা কেনোমতে সমর্থন করতে পারলেন না। কারণ, সামাজিক পরিবর্তনটি তাঁদের চোখে ধরা পড়লো না। গত চল্লিশ বৎসরে মুসলমান সমাজে অর্থনীতিগত কোনো পরিবর্তন ঘটেছে, এ তাঁরা কল্পনাও করতে পারলেন না। তাই বৃটিশবিরোধীদের উদ্দেশ্যে মওলানা মহম্মদ আলি উচ্চকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন :

"Has the Indian situation undergone a change ?"

তাছাড়া, অর্থনীতিগত কারণটা যাই থাক, বাইরে থেকে-ও কয়েকটা সহজগ্রাহ্য ঘটনা ঘটলো। তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য হোলো ইউরোপের ঘটনাবলী। কন্‌স্টাণ্টিনোপলে বিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটায় জাতীয়তাবাদী তুর্কী নেতাদের সংগে ভারতের অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মুসলমান নেতারা যোগাযোগ স্থাপন করলেন। ইংরেজদের বৈদেশিক নীতি ও রীতি থেকে ভারতীয় মুসলমানরা সহজেই বুঝলেন যে মুসলমানপ্রধান দেশগুলি পুনরায় তাদের স্বাধীনসত্তা লাভ ক'রে শক্তিমান সমৃদ্ধিমান হ'য়ে উঠুক, বৃটিশরা তা কখনো চায় না। এই বিশ্বাসের সমর্থন জুটলো ইজিপ্টে অধিকার-বিস্তারে বৃটিশের দৃঢ় তৎপরতা দেখে। কেবল তাই নয়, ইংরেজরা মরোক্কো সম্পর্কে ফ্রান্সের সংগে এবং পারস্য সম্পর্কে রাশিয়ার সংগে যে সন্ধি স্থাপন করলো, তা থেকে বা ত্রিপলিতে ইতালীয় আক্রমণ থেকে, ভারতীয় মুসলমানদের কোনো সন্দেহই রইলো না যে, সমগ্র খৃস্টান জগৎ ইসলাম জগৎকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে আজ বদ্ধপরিকর। ভারতীয় মুসলমানদের এই আতংককেই কার্যত প্রমাণ ক'রে দেওয়ার জন্যে যেন ঘটলো ১৯১২-১৩ খৃস্টাব্দের বল্কান যুদ্ধ। "ইসলামের তরবারি" তুরস্ককে ভেঙে ফেলবার জন্যেই যেন এলো ইউরোপীয় শক্তির সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র। ফলে সকল মতের ও সকল শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানগণ তাঁদের স্বধর্মী তুরস্ককে সাহায্য করার জন্যে অগ্রসর হ'লেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল মুসলমান দলগুলির নেতারা-ও 'রেড্ ক্রেসেণ্ট' ফাণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক হ'য়ে এলেন কন্‌স্টাণ্টিনোপলে। যুদ্ধরত তুরস্কের সাহায্যের জন্যে 'রেড্ ক্রেসেণ্ট ফাণ্ড'-এর তরফ থেকে ভারতবর্ষে প্রচুর চাঁদা তোলা হোলো। এঁদের সংগে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সংগে ঘটলো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাঁদের সংগে মতামত বিনিময়ে প্রভাবিত হ'য়ে ভারতীয় মুসলমানগণের এই

প্রগতিশীল দলগুলি তাঁদের বৃটিশ তোষনের নীতি ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। এইরূপে বৃটিশ সেবার শপথ নিয়ে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে যে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হ'য়েছিল, তা ধীরে ধীরে এলো এই বৃটিশবিরোধী ভারতীয় মুসলমানদের প্রভাবে এবং ভারতীয় মুসলিম লীগকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অনুরূপ একটি বৃটিশবিরোধী শপথ গ্রহণ করাতে চেষ্টা চলতে লাগলো। এমনিভাবেই ধীরে ধীরে আল্ হিলালের বাণী ও আদর্শ অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানের আদর্শে পরিণত হ'তে চললো।

তখন সৈয়দ ওয়াজির হাসান (পরবর্তী কালের জাস্টিস সার ওয়াজির হাসান) ছিলেন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি। গোড়ার দিকে তিনি আল্ হিলালের নীতির বিরোধিতা করলে-ও পরে বুঝলেন ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণের বৃটিশসেবী আলিগড়ী আদর্শের ওপর আর বিশেষ আস্থা নেই, এবং আল্ হিলালের আদর্শকেই তারা অনুসরণ করতে চাইছে। সুতরাং মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ক'রে গ'ড়ে তুলতে হ'লে চাই তার নীতির ও রীতির আমূল পরিবর্তন। এই উদ্দেশ্যে সৈয়দ ওয়াজির হাসান সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ ক'রে বেড়ালেন এবং সংগ্রহ করলেন জনসাধারণের ও বিভিন্ন জননেতাদের মতামত। তিনি কলিকাতায় আল্ হিলালের প্রবর্তক এবং সম্পাদক মওলানা আজাদের সংগেও সাক্ষাৎ ক'রে এ-বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। ফলে, ১৯১৩ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌ-এ অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগের যে বার্ষিক অধিবেশন হোলো, তাতে লীগের গঠনতন্ত্রের ও আদর্শের সংশোধন করা হোলো। "বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য এবং মুসলমানগণের অধিকার লাভের" স্থলে লীগের লক্ষ্য হিসাবে ঘোষণা করা হোলো "the attainment of suitable Self-Government for India." মওলানা সাহেব কিন্তু এই 'suitable'

কথাটি পছন্দ করলেন না। তিনি জানালেন যে, মুসলিম লীগের গঠন-তন্ত্রের বা আদর্শের মধ্যে আনুগত্যের স্থান রাখলে চলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে মওলানা আজাদের প্রধান প্রতিবাদী হিসাবে দাঁড়ালেন মওলানা মহম্মদ আলি। আলিগড়ের সুদীর্ঘ তালিমের হাত থেকে নিজেকে সহজে মুক্ত করার মতোন শক্তি তাঁর ছিল না। সুতরাং, তাঁর চেষ্টায় আনুগত্যের এই বিপজ্জনক বীজটি মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্রে সঞ্চিত হ'য়ে রইলো, যা থেকে এক দেশব্যাপী বিষাক্ত মহীরূহের জন্ম হোলো আরো কয়েক দশক বাদে।

ভারতীয় মুসলমানদের অসন্তোষ, যা ভারতের ভেতরে এবং ভারতের বাইরে ইউরোপে সংঘটিত কতিপয় ঘটনার ফলে দিনে দিনে প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠছিল, তা চরম অবস্থায় এসে পৌঁছলো ইউরোপে—প্রথম মহাযুদ্ধ বাধার কিছুদিন বাদেই। এতোদিন পর্যন্ত যে-সমস্ত 'রাজভক্ত' মুসলমান বৃটিশ-বিরোধী নীতিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, তাঁরা-ও অনেকে আজাদ-পরিচালিত আল্ হিলালের নীতিকেই একমাত্র অনুসরণীয় পথ ব'লে স্বীকার করলেন। আল্ হিলালের এখন গ্রাহক সংখ্যা পঁচিশ হাজারেরও অধিক এবং মুসলমান ভারতের সর্বত্রই তার প্রভাব অপরিমিত হ'য়ে উঠলো। আল্ হিলালের বৃটিশ-বিরোধী দিকটা বহু পূর্ব থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছিল, আর আল্ হিলালের সম্পাদক সম্পর্কে তো কথাই নেই! সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তরে তাঁর নাম বিপ্লবী যুগ থেকেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল। তখন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান কর্তা ছিলেন সার চার্লস্ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেব। তিনি এই তরুণ সাংবাদিককে কোনো রকমে ফ্যাশাদে ফেলার মতলবে ছিলেন। কিন্তু মওলানা আজাদের সুস্পষ্ট বৃটিশবিরোধী উক্তিগুলিকেও ঠিক আইনের কবলে ফেলা সহজে সম্ভব ছিল না। কারণ মওলানা সাহেবের

লেখনীর যেমন ছিল শক্তি, তেমনি ছিল সতর্কতা। ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সংগে সংগে আল্ হিলালের বৃটিশ-বিরোধী নীতি অনেক পরিমাণে জার্মাণ-প্রীতির রূপ নিতে বাধ্য হোলো। মওলানা সাহেব তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে বৃটিশ শক্তির অপপ্রচার এবং মিথ্যা আত্মম্ভরিতাকে তিরস্কৃত ও হাস্যাস্পদ করলেন। ফলে যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর সার জেম্স মেস্টনের প্ররোচনায় এলাহাবাদের 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা তাদের 'Pro-Germanism in Calcutta' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মওলানাকে জার্মাণ-প্রীতির অভিযোগে করলেন অভিযুক্ত। এই প্রবন্ধ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আল্ হিলালের পত্রিকার কার্যকলাপ সম্পর্কে এঁদের দৃষ্টি বহুকাল ধ'রেই সচেতন ছিল। প্রবন্ধে অভিযোগ করা হোলো: কোনো দিল্লীওয়ালা মুসলমান কলিকাতা থেকে উর্দু ভাষায় আল্ হিলাল নামে একটি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। যুক্ত প্রদেশে এই পত্রিকার প্রভাব প্রচুর। এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে-ও সম্ভবত এর প্রভাব অল্প নয়। যুদ্ধ বাধার পর থেকে এই পত্রিকা ক্রমাগত মিত্রশক্তির নিন্দা এবং জার্মাণির প্রশংসা ক'রে আসছে।

এতদিন পর্যন্ত সরকারের সতর্ক দৃষ্টি যে এর ওপর কেন পড়ে নি, সে সম্বন্ধে কারণস্বরূপ দেখানো হোলো:

(১) বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে এই পত্রিকার মার্জিত উর্দু দুর্বোধ্য। তাই বাংলায় এর ভয়ংকর প্রভাব অননুভূত। ফলে বাংলা সরকার এ সম্পর্কে অনবহিত। এই প্রসংগে এ-কথাও উল্লেখ করা হোলো যে 'দিল্লীওয়ালা মুসলমান' আবুল কালাম তাঁর 'হীন' রাজদ্রোহী কার্যকলাপের জন্যে যে কলিকাতাকে কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছেন, এ-ও তার একটি কারণ।

(২) এই পত্রিকার তীক্ষ্ণ ইংগিত এমন সূক্ষ্ম যে উর্দু ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদের কালে তার অনেকখানি বিষ ক্ষয় পেয়ে যায়, ফলে সরকারী রিপোর্ট থেকে উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারীরা এই পত্রিকার শক্তি ও অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে যথোচিত সচেতন হ'তে পারেন না।

'পাইওনিয়ার' পত্রিকার সম্পাদকের ভাষায় :

"The obvious intention of the writer of these lines is to make his co-religionists believe that Germany is invincible and that the Powers of the British Empire can do nothing to resist its attacks."

'পাইওনিয়ার' পত্রিকার উদ্দেশ্য যাই হোক, তার মন্তব্য ঘুণাক্ষরেও মিথ্যা ছিল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে এই পত্রিকায় যতো সংবাদ ও তথ্য সন্নিবিষ্ট হ'তো তেমনটি তখনকার ভারতীয় আর কোনো পত্রিকা-তেই হ'তো না। কারণ, আবুল কালামের মতো দুঃসাহসী সাংবাদিক ভারতীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসে অত্যন্ত বিরল।

পাইওনিয়ারের এই প্রবন্ধ অচিরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। সুতরাং 'আল্ হিলাল' পত্রিকার বিরুদ্ধে আশু ব্যবস্থারূপে করা হোলো পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত এবং পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষে পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ এবং মাদ্রাজ প্রবেশ নিষিদ্ধ। কেবল তাই নয়, ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে বাংলা সরকার আবুল কালামকে বাংলা প্রদেশ থেকে বিতাড়িত করলেন। গুরু পরিশ্রমের ফলে আবুল কালামের স্বাস্থ্য-ও ভেঙে পড়েছিল। তাই তিনি বাংলা দেশ ছেড়ে রাঁচিতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ভারত সরকার কিন্তু এতেই ক্ষান্ত হলেন না। আবুল কালামকে ১৯২০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিক পর্যন্ত রাঁচিতেই অন্তরীণ ক'রে রাখা হোলো।

এই অবস্থা এবং পুলিসের কড়া নজর সত্বেও মওলানা আবুল কালামের বৃটিশ-বিরোধী প্রচারে ছেদ পড়লো না। তিনি প্রতি শুক্রবারে উপাসনা কালে মসজিদে তাঁর স্বধর্মীদের প্রতি উপদেশ দিতে লাগলেন ; তাঁদের বোঝাতে চাইলেন, তাঁরা যেন ভ্রমেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটচক্রে পা না দেন। বৃটিশ শাসকদের মৈত্রী তাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র মাত্র।

এই অন্তরীণ অবস্থাতে আবুল কালাম তাঁর ব্যক্তিগত স্মৃতির ওপর ভিত্তি ক'রে রচনা করেন তাঁর "তাজকিরা" পুস্তকখানি। মহাদেব দেশাই তাঁর আবুল কালামের জীবনীতে এই পুস্তক সম্পর্কে বলেন :

"It is a masterpiece of elusive style that holds the reader until he gets to the end of the book, and yet I am told very few pages are devoted to giving any facts of his own life."

আবুল কালাম পরবর্তী কালে কোরাণের যে-টিকা রচনা করেন, তার-ও একটি অংশ এই অন্তরীণ অবস্থাতেই লিখিত হয়।

১৯২০ খৃস্টব্দের গোড়ার দিকে যখন আবুল কালামের অন্তরীণ অবস্থার শেষ হোলো, তখন সমস্ত ভারতবর্ষে এসেছে এক অভাবনীয় প্লাবন। সে প্লাবন সমগ্র দেশব্যাপী সংগ্রামের, সে প্লাবন হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর, মিলনের।

কিন্তু এই প্লাবনের দুর্বার স্রোতে সাধারণ দেশ-সেবীর মতো আবুল কালাম ভেসে গেলেন না। তিনি সেই বন্যার বেগকে করলেন সংহত, সুচালিত, যার পলি মাটিতে একদা সমগ্র ভারতে মুক্তির ফসল ফলতে পারে। আজ ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বেদনার সংগে

স্বীকার করতে হয়, বিরুদ্ধ শক্তির তরংগাঘাতে তাঁর সে-সারথ্য হ'য়েছে ব্যর্থ,—ভারতবাসীরা হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর ফসল ঘরে তুলতে পারে নি। না পারুক; তবু আজো আবুল কালাম নির্ভীক, অটল, তিনি অংগুলি সংকেত করেন ভবিষ্যতের পানে, যেখানে হিন্দু-মুসলমানের মিলন অনিবার্য, অবশ্যম্ভাবী।

১৯১৯ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯২১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কয়েকটি বৎসর ভারতের ইতিহাসে একটি অনবদ্য যুগ। ১৯২০ খৃস্টাব্দে আবুল কালাম যখন তাঁর অন্তরীণ দশা থেকে মুক্তি পেলেন, তখন সমগ্র দেশে যে দুর্বার জাগরণ দেখলেন, তার জন্যে ঠিক মতো প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আঘাত যে এতো আসন্ন হ'য়ে উঠেছে, তিনি তা মনে-প্রাণে কল্পনা করলেও অচিরে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করবেন, এমন আশা করেন নি।

রাউলাট আইন পাশের সংগে সংগে গান্ধীজির নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ তার জরাজীর্ণ অস্তিত্বের রুগ্ন শয্যা থেকে যেন এক জাদুদণ্ড স্পর্শে জেগে উঠেছে। ভারতের গ্রামে, নগরে জনপদে সাম্রাজ্যবাদী দর্পকে ব্যর্থ ব্যাহত করবার জন্যে এক পতাকাতলে সমবেত হয়েছে ভারতের আবালবৃদ্ধ নরনারী। এই অহিংসার সংগ্রামে অস্ত্রধারণ ও অভিযানের দীর্ঘকালব্যাপী নিপুণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না, ছিল কেবল অদম্য উৎসাহের, অনমনীয় উদ্দেশ্যের, অকাতর আন্তরিকতার। তাই ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, রুগ্ন-সুস্থ, সবল-দুর্বল, বালক-বৃদ্ধ ভারতীয় সমস্ত নরনারীরই এই স্বাধীনতার সৈন্যদলে যোগদানের সুযোগ ঘটেছিল। অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ হ'য়ে উঠেছিল এক অহিংস বারুদের গুদামখানা, যার বহ্নিমান প্রদাহে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভস্মীভূত হবার উদ্যোগ করেছিল।

অহিংস যুদ্ধের সর্বাপেক্ষা নিপুণ অস্ত্র হোলো ধীর ও বিদ্বেষবিহীন সহিষ্ণুতা। কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে যখন এই জনতার বিপুল যুদ্ধাস্ত্র চালনার উদ্যোগ হোলো, তখন দেখা গেলো স্থানে স্থানে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব অহিংসার সেরা অস্ত্র সহিষ্ণুতার মনোভাবকে ব্যাহত করছে। পাঞ্জাবে কয়েকটি সহিংস দুর্ঘটনা ঘটলো। তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে অনুষ্ঠিত হোলো অমৃতশহরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড—যার কলংক সমস্ত শ্বেত-সভ্যতাকে লজ্জিত করেছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড কেবল হিন্দুদের আঘাত করলো না। জেনারল ডায়ার এবং তাঁর সৈন্য-বাহিনীর নির্মম কামানের গোলায় যে বালকবৃদ্ধ নরনারী রক্তের বন্যায় ভেসে গেলো, তাদের মধ্যে বহুসংখ্যায় ছিল মুসলমান এবং শিখ। ফলে যুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে বৃটিশ বিদ্বেষ ঘনিয়ে উঠেছিল, তা পূর্ণতা লাভ করলো অমৃতশহরের বধ্যভূমিতে। ১৯১৯ সালে অমৃতশহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হোলো, তাতে ভারতীয় মুসলমানগণ দলে দলে এসে যোগদান করলেন এবং শপথ গ্রহণ করলেন ভারতে বৃটিশ শাসনের নিশ্চিত উচ্ছেদের। ভারতের বাইরেকার মুসলমানদের সংগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষে-ও যে-সমস্ত মুসলমানের বৃটিশ-প্রীতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নি,অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ড তাঁদেরকে-ও অকুণ্ঠচিত্তে বৃটিশ-বিরোধী ক'রে তুললো। মওলানা মহম্মদ আলির মতো একদা বৃটিশ-প্রেমিক আলিগড়পন্থী-ও ঘোষণা করলেন :

"It was reserved for General Dyer to break down entirely the barrier that Sir Syed Ahmed Khan had for temporary purposes erected more than thirty years previously, and to summon the Mussalmans of

India to the Congress fold at Amritasar in 1919 as the unsuspecting Herald of India's Nationhood."

অমৃতশহরের হত্যাকাণ্ড যে কেবল ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণকে বৃটিশবিরোধী ক'রে তুললো তাই নয়, তারা আঘাত করলো এমন একটি সম্প্রদায়কে, যারা দীর্ঘকাল ধ'রে বৃটিশ শাসনের প্রতি অক্ষুণ্ণ প্রীতি ও বিশ্বাস দেখিয়ে এসেছিল। এই সম্প্রদায়টি হোলো শিখ সম্প্রদায়। অমৃতশহরের পুণ্যভূমিতে হিন্দু-মুসলমানের রক্তধারার সংগে শিখদের রক্তের-ও ত্রিবেণী-সংগম ঘটলো। এমনি ভাবে সেদিন হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ, এই তিন সম্প্রদায়ের যে রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘটলো, তাতে বৃটিশবিরোধী জাতীয়তা-বাদের এক বিপুল শক্তির হোলো উদ্ভব—এর পূর্বে যা স্বপ্ন মাত্র ছিল।

দীর্ঘকালব্যাপী বৃটিশ তোষণের যোগ্য পুরস্কাররূপে কেবল অমৃতশহরে মুসলমানদের হত্যাকাণ্ডই ঘটলো না, সেই সংগে বৃটিশ শাসকেরা বিনা দ্বিধায় করলো খিলাফতের অংগীকার অস্বীকার। ১৯১৪-১৮ খৃস্টাব্দের মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলমানগণের সাহায্য যখন বৃটেনের পক্ষে অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছিল, তখন ভারতীয় মুসলমানদের সাহায্যের বিনিময়রূপে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী অংগীকার ক'রেছিলেন, ইসলামের পবিত্র স্থানগুলিকে তাঁরা অমুসলমান শাসনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এই অংগীকার ভংগের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষের সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তাঁরা শপথ নিলেন এই অন্যায়ের, এই প্রতারণার প্রতিশোধ নিতে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মতো ভারতের হিন্দু সম্প্রদায়-ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে প্রতারিত হ'য়েছিলেন। বৃটিশ যখন মহাযুদ্ধের মহাদুর্যোগে প'ড়েছিল, যখন ভারতীয়দের জনবল ও ধনবল ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না, তখন সে যুদ্ধশেষে ভারতীয়দেরকে শাসন-স্বাতন্ত্র্য দেওয়ার অংগীকার ক'রেছিল। কিন্তু

যুদ্ধশেষে বৃটিশ যখন জয়লাভ করলো, ফিরে এলো তার পুরাতন প্রতিষ্ঠা, তখন অবহেলায় সে-অংগীকার সে ভংগ করলো। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া তো দূরের কথা, যুদ্ধের সময়ে-ও ভারতীয়দের ব্যক্তিস্বাধীনতা যেটুকু অক্ষুণ্ণ ছিল, তা-ও রাউলাট আইনের বলে হোলো সম্পূর্ণ অপহৃত। এমনি-ভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই হোলো প্রতারিত, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের অংগীভূত হোলো মুসলমানদের খিলাফতের দাবী।

সংগ্রাম শুরু হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানেরা বৃটিশের সংগে আপোষমীমাংসা করার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন। কারণ, বৃটিশ শাসক শ্রেণীর ওপর তাঁদের বিশ্বাস যতোই লোপ পাক না কেন, বৃটিশ জাতির ওপর—যে বৃটিশের শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি ক'রে ভারতীয় বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটেছে—সম্পূর্ণ আস্থা তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হারাতে পারলেন না। তা ছাড়া, অহিংসা ও অসহযোগের গোড়ার কথা হোলো শত্রুর সাধু ইচ্ছা সম্পর্কে বিশ্বাসী হওয়া। তাই ভারতীয় হিন্দু মুসলমানেরা একযোগে বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের খিলাফৎ সংক্রান্ত দাবী পেশ করার সিদ্ধান্ত করলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের এই সন্ধিক্ষণেই আবুল কালাম তাঁর অপরি-সীম উৎসাহ, অদম্য শক্তি, অতুলনীয় জ্ঞান ও বাগ্মিতা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণের সম্মুখে। মুসলমান নেতাদের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ হ'লেও বৃটিশবিরোধিতায় ও হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্রতে তিনিই যে সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ হবেন, সে-সম্বন্ধে যেমন কোনো সংশয় রইলো না মুসলমান জনসাধারণের, তেমনি রইলো না মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ হিন্দু নেতাদের-ও। মহাত্মা গান্ধী আবুল কালামকেই মুসলমান নেতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্যরূপে গ্রহণ করলেন। আবুল কালাম-ও স্বয়ং কেন

মহাত্মাকে তাঁর নির্ভরযোগ্য নেতা ও পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করেছিলেন, সে সম্পর্কে পরবর্তীকালে একটি কৌতুককর কাহিনীর তিনি উল্লেখ করেন। কোনো এক সময়ে মহাত্মা গান্ধীর স্ত্রী কস্তুরাবাই গান্ধী হরিজন তহবিলের কেনে প্রাপ্য দানকে অবহেলাবশে হরিজন তহবিলে জমা দিনে ভুলে যান। এই ব্যাপারটি মহাত্মাজীর কানে এলে মহাত্মাজী কস্তুরাবাইকে তিরস্কার করেন এবং স্বীয় স্ত্রীর এই ত্রুটিকে গোপন করার চেষ্টা তো দূরের কথা, এ সম্বন্ধে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে একথা জনসাধারণকে জানিয়ে দেন। গান্ধীজির এই কাজটি আবুল কালামের মনে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করে। আবুল কালাম বলেন যে, তখনই তাঁর কেমন যেন ধারণা জন্মে, ইনিই সেই নিঃস্বার্থ, সত্যব্রতী মহাপুরুষ যাঁর হাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাগ্যকে বিনা দ্বিধায় ছেড়ে দেওয়া সম্ভব। আবুল কালামের এই ধারণা মিথ্যা হয় নি। ১৯৪৬-৪৭ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষ যখন এক বিষাক্ত কুৎসিত হিংসায় রোগগ্রস্ত মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে, তখনো এই মহাপুরুষই নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে বরাভয়করে অগ্রসর হয়েছেন সংকীর্ণমনা হিন্দুদের নির্মম খড়্গের আঘাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে। আজ ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে সমস্ত মুসলমান ভারত যেমন নিঃসন্দেহে ভীত নিঃস্পন্দ চক্ষে তাকিয়ে আছে এই অনির্বাণ মানবশিখাটির দিকে, খিলাফতের দিনেও তারা তাকিয়েছিল এমনিভাবে। সেদিন-ও ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে আহ্বান ক'রে অংগুলি সংকেত করেছিলেন আবুল কালাম আজাদ।

আবুল কালামের জীবনীকার মহাদেব দেশাইকে আবুল কালাম এ সম্পর্কে এই সময়কার ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দেন। তার মোটামুটি অর্থ এই :

১৯২০ খৃস্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে গান্ধীজির সংগে

মওলানা আবুল কালামের সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। তুরস্ক সম্পর্কে ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব ভারত সরকারকে জানাবার জন্যে বড়লাটের কাছে একটি প্রতিনিধ-দল প্রেরণের কথা ছিল। এই প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভারতবর্ষের সমস্ত শ্রেষ্ঠ হিন্দু-মুসলিম নেতা-ই দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সবার সংগে ইতিপূর্বেই মওলানা আবুল কালাম-ও নিজের স্বাক্ষর দান করেন। কিন্তু এই প্রতিনিধিত্বে বা আপোষ-মীমাংসার চেষ্টায় যে কোন সুফল হবে, এমন কোনো আশা আজাদ কখনো পোষণ করতেন না। তাই তিনি অন্যতম প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের সংগে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু অবশেষে মওলানা মহম্মদ আলি এবং অন্যান্য বন্ধুদের সনির্বন্ধ অনুরোধে আবুল কালামকে নিজের পরিপূর্ণ সংশয় সত্ত্বেও এই প্রতিনিধি-দলে যোগ দিতে হয়।

যথাসময়ে বড়লাটের সংগে এই প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ ও আলোচনা ঘটলো। কিন্তু কোনো ফল হোলো না। বড়লাট কেবলমাত্র এই ভরসা দিলেন যে যদি লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের কাছে কোনো প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়, তবে তিনি তাঁদের লণ্ডন যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারেন। স্থির হোলো, মওলানা মহম্মদ আলির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল লণ্ডনে প্রেরিত হবে। মওলানা মহম্মদ আলির-ও এতে কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু এই সময় একটি প্রশ্ন উঠলো যে লণ্ডনে কেবল একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েই ভারতীয় মুসলমান জনসাধারণ সন্তুষ্ট থাকবে কি না, কিম্বা প্রতিনিধি দল প্রেরণ ছাড়া-ও অন্য কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে। এই প্রশ্নের উত্তরে মওলানা জানালেন, এই অনুযোগ-অনুনয়, আবেদন নিবেদন এবং ভিক্ষাবৃত্তির বহু-পুরাতন উপায়ে কোনো সুফল হবে এমন আশা তিনি কখনো করেন না। এখন প্রয়োজন, কোনো নূতন পন্থার

অবলম্বন—বৃটিশ তথা ভারত সরকারকে সরাসরি চাপ দেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ নেতারাই এই সংগ্রামের পথে আসতে দ্বিধা বোধ করলেন, আপোষ-মীমাংসা এবং অনুনয়-আবেদনের স্বর্ণ পথই তাঁদের কাছে অনন্য এবং অভ্রান্ত হ'য়ে রইলো। এই বিষয়ে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টাকালব্যাপী আলাপ-এবং তর্কবিতর্ক চললো হাকিম আজমল খানের বৈঠকখানায়। অবশেষে গান্ধীজি প্রস্তাব করলেন যে দুই কিম্বা তিনজনকে নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠিত হোক। এই সাব-কমিটি তাঁর সংগে পরামর্শ ক'রে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তাকে বৃহত্তর একটি কমিটির কাছে পেশ করা হবে এবং অতঃপর সেই কমিটির সিদ্ধান্ত-ই গণ্য হবে চূড়ান্ত ব'লে। তাই মওলানা আজাদ এবং হাকিম আজমল খানকে নিয়ে এই সাব-কমিটি গঠিত হোলো। এই সাব-কমিটি গান্ধীজির সংগে অধ্যক্ষ রুদ্রের বাসভবনে এলেন এবং সেখানে তাঁর সংগে তিন ঘণ্টা কাল ধ'রে গোপনে আলাপ-আলোচনা করলেন। আলোচনার ফলস্বরূপ প্রস্তুত হোলো অসহযোগের অমোঘ কর্মসূচী। গান্ধীজি একটি কর্মসূচী মওলানা আবুল কালাম এবং হাকিম আজমল খানের নিকট উত্থাপিত করলেন এবং বিশদরূপে তা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালেন। প্রতিটি বিষয়ে-ই আবুল কালাম গান্ধীজির সংগে একমত হ'লেন। স্পষ্টই বোঝা গেল, এই অসহযোগ ভিন্ন দর্পিত বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদীদের বাধ্য করার আর কোনো দ্বিতীয় উপায় নেই।

পরদিন পুনরায় প্রতিনিধিদলের এক সম্মিলন হোলো। এই সভায় মহাত্মাজি অসহযোগের কর্মপন্থা সম্পর্কে সুচারুরূপে বিশদ ব্যাখ্যা দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রাচীনপন্থী মুসলমান জননেতা গান্ধীজির অসহযোগের এই প্রস্তাবকে সহজে গ্রহণ করতে পারলেন না। কিন্তু মহাত্মাজীর মতোই মওলানা আবুল কালাম ছিলেন জাত বিপ্লবী। আতংক, সংশয় ও দ্বিধার

স্থান তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই তিনি যখন গান্ধীজির এই বিপ্লবী কর্মসূচীকে অবিলম্বে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করলেন, তখন বৃটিশের প্রতি বিশ্বস্ততায় অভ্যস্ত অধিকাংশ মুসলমান নেতারা তাঁকে দেখতে লাগলেন সংশয় ও ভীতির চোখে। মওলানা আবদুল বারি, মওলানা মহম্মদ আলি এবং মওলানা শওকত আলি প্রভৃতি নেতারা "ভেবে দেখার মত" সময় চাইলেন।

এই সময় মীরাটে খিলাফৎ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হোলো। ফলে গান্ধীজি এবং মওলানা আবুল কালাম দিল্লী থেকে মীরাট যাত্রা করলেন। গান্ধীজি এই সম্মিলনে জনসাধারণের সমক্ষে তাঁর অসহযোগের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। যে-প্রস্তাবকে প্রাচীনপন্থী নেতারা সংশয়ের চক্ষে, দ্বিধার চক্ষে, আতংকের চক্ষে দেখছিলেন, সেই প্রস্তাবকেই জনসাধারণ সমর্থন জানালো তুমুল উৎসাহের সংগে।

ফেব্রুয়ারির শেষাশেষি দ্বিতীয় খিলাফত সম্মিলন হোলো কলিকাতায়। এই সম্মিলেনে সভাপতিত্ব করলেন মওলানা আজাদ স্বয়ং। মওলানা তাঁর সভাপতির অভিভাষণে মুসলমান জনসাধারণকে অসহযোগের কর্মসূচী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণের জন্যে পরামর্শ দিলেন। এই পরামর্শ দেশব্যাপী উৎসাহের সংগে গৃহীত হোলো।

অতঃপর কলিকাতা এবং নাগপুরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হোলো, তাতে মুসলমান জনসাধারণের সহযোগিতায় অসহযোগের কর্মসূচী বিপুল ভোটাধিক্যে হোলো গৃহীত। এবার শুরু হোলো দেশময় সংগ্রামের জন্যে এক মহাপ্রস্তুতি।

গ্রামে শহরে নগরে জনপদে সমিতির পর সমিতি, সভার পর সভা, সম্মিলনের পর সম্মিলন চলতে লাগলো। উৎসাহিত কোলাহলে আর

ধ্বনিতে আবর্তিত হ'য়ে উঠলো বিদ্রোহী ভারতের নীল আকাশ। সহস্রে সহস্রে, লক্ষে লক্ষে এগিয়ে চললো মানবের বিপুল দুর্বার স্রোত এক মহাসংগ্রামের সংগম তীর্থের অভিমুখে। মহাত্মা গান্ধী, মওলানা আবুল কালাম, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা মহম্মদ আলি, মওলানা শওকৎ আলি, পণ্ডিত মতিলাল এবং পণ্ডিত জহরলাল, এঁদের মন্দ্র-মুখর কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠলো ভারতের প্রতিটি সুপ্তি-গুহা। জাগরণের কল-কল্লোল শোনা গেল। গান্ধীজি তাঁর নিয়মিত কর্মসূচী অনুসারে কাজ ক'রে চললেন অক্লান্ত নিয়মিত ভাবে। মুসলমান জনসাধারণ তাঁকে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দিয়ে বরণ করলো, তা অপ্রত্যাশিত,অসাধারণ। সেদিনের সে অবিসংবাদিত শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণের দুরাশা কোনো মুসলমান জননেতারও ছিল না। মুসলমান মহিলাদের সভায়,এমন কি, মওলানা মহম্মদ আলিকে-ও চোখ বাঁধা অবস্থায় যেতে হোতো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে মহাত্মাজীর গতি ছিল অবাধ। তাঁকে রক্তমাংসের দুর্বলতার বহু উর্ধ্বে ব'লে গ্রহণ করেছিল মুসলমান জনসাধারণ। আর এ জন্যে মুসলমান জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কৃতিত্ব ছিল যাঁর সব চেয়ে বেশি, তিনি তরুণ বিপ্লবী আবুল কালাম আজাদ স্বয়ং।

একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হোলো। স্কুল কলেজ ছেড়ে দলে দলে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্যে বেরিয়ে এলো। বহু আইনজীবী বৃটিশ ভারতের আদালতে তাঁদের বুদ্ধি-বিক্রয় বন্ধ ক'রে ওকালতির অপমান করতে চাইলেন না। এঁদের অনেকেই আইন ব্যবসায় ত্যাগ করলেন সমস্ত জীবনের মতো। এই ত্যাগ অনেকের পক্ষে নিতান্ত সামান্য নয়, হয়তো বহু সহস্র টাকা। পণ্ডিত মতিলাল, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সর্দার বল্লভ ভাই,

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং শ্রীরাজাগোপালাচারী সকলের মাসিক রোজগার এক একটি জমিদারীর মাসিক আয়ের সমান ছিল। দেশের সেবার জন্যে তাঁরা নিঃসংকোচে তা ত্যাগ করলেন। শুধু এই বৃহৎ ত্যাগই যে উল্লেখযোগ্য তা' নয়; সাধারণ মধ্যবিত্ত, গরীব দিনমজুর, অন্তঃপুরবাসিনী মহিলা,--এই ত্যাগের মহামঞ্চে তাঁদের সকলেরই অঞ্জলি এসে সঞ্চিত হোলো। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মহাত্মার দেশসেবার উদ্দেশ্যে উৎসৃজিত ভিক্ষাভাণ্ড উঠলো ভ'রে—দেশবাসীর অকুণ্ঠ আত্মদানে।

ছয়

সমগ্র ভারতবর্ষে যখন এমনি এক জাগরণ ঘটছে, তখন ভারত-সরকার তার প্রতিরোধের জন্যে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৯২১ খৃস্টাব্দের শেষ কয়েক সপ্তাহে সে প্রচেষ্টা সপ্তমে এসে পৌছলো। গত সমস্ত বৎসরকাল ধ'রেই আইন ও শৃংখলা রক্ষার নামে দেশময় উচ্ছৃংখল অত্যাচারের সীমা ছিল না। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন সাধারণ কর্মী ও জনসাধারণের ওপরই সাধারণত অনুষ্ঠিত হোতো। এবার তা শীর্ষস্থানীয়দের-ও স্পর্শ করলো। রাজদ্রোহ এবং শৃংখলা ভংগের অপরাধে মওলানা মহম্মদ আলি, মওলানা শওকৎ আলি এবং আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বন্দী হ'লেন। মওলানা মহম্মদ আলি তখন মহাত্মাজীর সংগে দেশের নানা স্থানে ফিরে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে সংঘবদ্ধ করছিলেন দেশের জনসাধারণকে। মহাত্মাজির সংগে একটি জনসভায় বক্তৃতা করতে যাওয়ার পথেই মওলানা মহম্মদ আলিকে গ্রেফ্‌তার করা হোলো। অবিলম্বেই এই গ্রেফ্‌তারের প্রতিবাদে মহাত্মা-জীর কঠোর কণ্ঠস্বর ভারত সরকারকে শাসন ক'রে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো। তিনি আহ্বান জানালেন সমগ্র ভারতবাসীর কাছে ভারত সরকারের এই স্পর্ধিত কার্যের যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে। জানালেন: মওলানা মহম্মদ আলির অপমান, সমগ্র খিলাফত আন্দোলনের অপমান। আর খিলাফত আন্দোলনের অপমান সমগ্র স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষেরই অপমান। এই অপমানের প্রতিবিধান চাই।

"In imprisoning Maulana Mahomed Ali, the

Government have imprisoned the Khilafat, for the two brothers are the truest representatives of Khilafat."

কয়েক দিন বাদে বোম্বাইএর গভর্ণর এক সরকারী ইস্তাহারে মওলানা শওকত আলি এবং অন্যান্য পাঁচ ব্যক্তির গ্রেফ্তারের কারণ সম্পর্কে উল্লেখ করলেন যে তাঁরা করাচীতে এক সভায় দেশীয় সৈনিকদের প্ররোচিত এবং উত্তেজিত ক'রে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। সরকার অন্যান্য সকল প্রকার স্বদেশী বেয়াদবি বিনা কসুরে মাফ করলে-ও সিপাইদের এইভাবে উত্তেজিত করার ব্যাপারে কোন প্রকারে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। সুতরাং কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। বস্তত, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রধান স্তম্ভ হোলো এই দেশীয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী। তাদের বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের উপরই বৃটিশ সাম্রাজাবাদীদের সকল ভরসা। সুতরাং এ ধরণের কোনো বিপ্লবী কার্যকলাপ ভারত সরকারের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ। তাছাড়া, ভারত-প্রবাসী শ্বেতাংগরা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সেই ভয়াবহ কাহিনী আজো ভোলে নি। কারণ, তখনো সরকারী রেকর্ড ও ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক বলিষ্ঠ জাতির অদম্য স্বাধীনতা-স্পৃহার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল। তবে, কেবল সৈন্যদের উত্তেজিত বা প্ররোচিত করার জন্যেই যে সরকার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, একথা বলাও ভুল হবে। ভারত সরকার যে এবার সকল দিক থেকেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন, এই ব্যাপারটি ছিল তারই প্রথম সংকেত মাত্র। কারণ, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই বুঝেছিলেন, এখনই যদি নিতান্ত নির্লজ্জ নৃশংস ভাবে এই নবজাগ্রত ভারতকে আঘাত দেওয়া না যায়, তবে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমাপ্তি নিঃসন্দেহে আসন্ন। মহাত্মা গান্ধী এবং দেশের

জনসাধারণ বোম্বাই সরকারের এই সংকেতকে তার যথোচিত পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করলেন। গান্ধীজি তাঁর স্বভাব সুলভ তির্যক রসিকতার সংগে বললেন :

"স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেস এবং তারও পূর্বে কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি বা তারও পূর্বে আমি স্বয়ং যে দেশীয় সিপাইদের বৃটিশ-আনুগত্য ভংগের চেষ্টা করেছিলাম, সে বিষয়ে বোম্বাই সরকার বিন্দুমাত্র অবহিত নন।······করাচী সম্মিলন তার ইসলামিক ভংগীতে কংগ্রেসী ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। মাননীয় লাটসাহেব মওলানা মহম্মদ আলি এবং মওলানা শওকত আলি সম্পর্কে যে রাজদ্রোহ এবং সৈন্যদের উত্তেজিত করার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে রাজদ্রোহের উল্লেখটি অপেক্ষাকৃত মার্জনীয়। কারণ, তাঁর জানা উচিত ছিল, রাজদ্রোহই কংগ্রেসের আদর্শে পরিণত হয়েছে। সর্বৈবভাবে বর্তমান সরকারের প্রতি অনানুগত্য ঘোষণার অংগীকারে তাঁরা সকলেই আবদ্ধ। বোম্বাই গভর্ণরের সরকারী ইস্তাহারের জবাবে মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তি একটি ইস্তাহার রূপে প্রকাশিত হোলো। এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করলেন দেশের সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা।

"We, the undersigned, speaking in our individual capacity, desire to state that it is the inherent right of everyone to express his opinion without restraint about the propriety of citizens offering their services to, or remainng in the employ of the Government, whether in the civil or the military department. We, the undersigned, state it as our opinion that it

is contrary to national dignity for any Indian to serve as a civilian, and more especially as a soldier, under the system of government which has brought about India's economic, moral, and political degradation, and which has used the soldiery and the police for repressing national aspirations, as for instance at the time of the Rowlatt Act agitation, and which has used the soldiers for crushing the liberty of the Arabs, the Egyptians, the Turks and other nations who have done no harm to India."

এই দৃঢ় ঘোষণার প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। এবং ঠিক তার পরেই, দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

এই ঘোষণার পর সমস্ত ভারতবর্ষে সামরিক ও অসামরিক আনুগত্যের বিরুদ্ধে তুমুল সাড়া পড়ে গেলো। চাকরি ছাড়ো, শাসন ব্যবস্থা বানচাল করো, সৈন্যবাহিনী ভেঙে ফেলো—এই হোলো দেশব্যাপী অবিরাম ধ্বনি, স্বাধীনতা-সাধনার অমোঘ মন্ত্র।

কিন্তু ক্ষিপ্রহস্তে এই আহ্বানের কণ্ঠরোধের জন্যে সরকারকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল না। তারা কেবল স্তম্ভিত বিস্মিত আতংকগ্রস্ত হ'য়ে রইলো। কোটি কোটি মানুষের এমন অদম্য অকুণ্ঠ জাগরণ তারা প্রত্যাশা করে নি, কল্পনা করে নি।

ঘটনার পর ঘটনা ভারতের বলিষ্ঠ জাতীয় জীবনকে কর্মচঞ্চল ক'রে তুললো। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের দিন স্থির হ'য়েছিল। এই উপলক্ষে ভারত সরকার সমস্ত দেশে বিপুল সমারোহ ও উৎসব-আনন্দ

করতে চাইলো, বাইরের উৎসব অভ্যর্থনার কোলাহলে চাপা দিতে চাইলো দেশের দাবীকে। এ-যেন সমস্ত ভারতবাসীর জাতীয়তার সংগ্রামকে অস্বীকার করা, ব্যংগ করা। কংগ্রেস তাই প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে বয়কট করার সিদ্ধান্ত করলেন। সমস্ত সমারোহের বর্জন, সকল উৎসবের ব্যর্থতা, এই হোলো কংগ্রেসের নির্দেশ। সেই সংগে একথা-ও ঘোষণা করা হোলো যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রতি ভারতবাসীর কোনো অভিযোগ নেই। তাঁর অতিথি-সৎকারের যে অভাব ঘটলো অতিথিবৎসল ভারতে, তার কারণ, তিনি যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে এসেছেন, তার প্রতি দেশবাসীর অসমর্থন-জ্ঞাপন, শান্ত সুগম্ভীর বিক্ষোভ-প্রদর্শন।

এই ব্যাপারের জন্যে দেশের সর্বত্র স্বেচ্ছাসেবক সংগৃহীত হ'তে লাগলো। বাংলা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশ সরকার এই ধরণের সকল স্বেচ্ছাসেবক প্রতিষ্ঠানকেই বে-আইনী এবং স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহকে অপরাধ ব'লে ঘোষণা করলেন। কিন্তু সরকারী ইস্তাহারের প্রতি দেশের জনসাধারণের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা ছিল না। সুতরাং ভারতীয়েরা এই সরকারী নির্দেশকে হাসিমুখে অবহেলা ক'রে পূর্ণ উদ্যমের সংগে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ চালাতে লাগলো। কেবল স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহই চললো না, সংগৃহীত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম-ও নিয়মিতভাবেই প্রকাশিত হ'তে লাগলো, বুলেটিনে, সংবাদপত্রে। বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকায় সর্বপ্রথমে এলো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম। এবং তাঁর পরে-ই দ্বিতীয় নাম, আবুল কালাম আজাদের।

প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষেই এই বয়কট সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হোলো। কেবলমাত্র বোম্বাইএর কয়েক স্থানে হিংসা ও দাংগাহাংগামা দেখা দিল।

গান্ধীজী অবিলম্বে বলিষ্ঠ হাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন, নিন্দিত তিরস্কৃত করলেন অহিংসায় অপটু জনসাধারণকে। এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল এবং পণ্ডিত জহরলালের ব্যবস্থাপনায় 'বয়কট' সুন্দর ভাবে প্রতি-পালিত হোলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং মওলানা আবুল কালামের পরিচালনায় কলিকাতা শহরও নিখুঁতভাবে পালন করলো বয়কট। প্রিন্স অব ওয়েলস্ কলিকাতার পথ অতিক্রম করলেন—জনহীন,পরিত্যক্ত, নিঃশব্দ জনপদ—যেন কোনো যুদ্ধের ফলে কিম্বা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সমস্ত কলিকাতা নির্জন শ্মশান-পুরীতে পরিণত হয়েছে, একটি দিনে, একটি রাত্রিতে। এমন অহিংস অনভ্যর্থনা পৃথিবীর ইতিহাসে আর ঘটে নি!

অপমান, নিতান্ত অহিংস হ'লেও যে অপমান, সে কথা বোঝার মতো শক্তি ভারত সরকারের তখনো ছিল। তাই অবিলম্বে তাঁরা প্রতি-শোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। দেশে ধরপাকড় এমন ব্যাপকভাবে চলতে লাগলো যে সে যেন সরকার পক্ষ থেকে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত-আগমন উপলক্ষ্যে পৈশাচিক উৎসবের তালিকাভুক্ত একটা অনুষ্ঠান। দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হ'লেন। বাংলা দেশে দেশবন্ধু এবং মওলানা আজাদ, যুক্ত প্রদেশে পণ্ডিত মতিলাল এবং জহরলাল, লালা লজপত রায় হোলেন বন্দী। সাধারণ বন্দীদের তো সংখ্যাই রইলো না। ১৯২১ এর ডিসেম্বর এবং ১৯২২ এর জানুয়ারির মধ্যে অন্যূন ত্রিশ হাজার লোক গ্রেপ্তার এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারারুদ্ধ হ'লেন। তাঁরা কেউ আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারালয়গুলি যে বৃটিশ শাসনের কতক-গুলি ঘাঁটি মাত্র, বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অস্বীকারে তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

ঐ বৎসরের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার কথা

ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের এবং মুসলিম লীগের অধিবেশনে মওলানা আবুল কালাম আজাদের। কিন্তু সভার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই তাঁরা গ্রেপ্তার হ'লেন। দেশবন্ধু এবং আবুল কালামের বিচারের দিন নানা অজুহাতে ক্রমেই পিছাতে লাগলো। এমনি ভাবে প্রায় তিন মাস কাটলো। বিচারে মওলানা সাহেবের এক বৎসরের হোলো কারাদণ্ড। বিচারের সময় তিনি আদালতে একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি দিলেন। সত্যাগ্রহী বন্দীদের মধ্যে ঐ ধরণের বিবৃতি আরো অনেকেই দিয়েছেন, কিন্তু মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিবৃতিটি অতুলনীয়। এই বিবৃতিতে তিনি খিলাফত এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অর্থ ও স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটি বিবরণ দেন। বক্তৃতাটি সাধু উর্দু ভাষায় লিখিত ছিল। এই প্রবন্ধে কেবল যে আবুল কালাম আজাদের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিহাস এবং দর্শন সম্পর্কে সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাই নয়। এই প্রবন্ধে অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত ধারণার-ও পরিচয় পাওয়া যায় স্পষ্টরূপে। অহিংসায় তিনি মহাত্মাজীর মতো অন্ধ-বিশ্বাসী নন। তাঁর অহিংসায় বিশ্বাস কতোকটা পণ্ডিত জহরলালের অনুরূপ —অহিংসা হোলো expedient বা বিশেষ অবস্থায় উপযোগী একটি রীতি মাত্র। আবুল কালাম তাঁর এই বিবৃতির এক স্থানে বলেন:

"সশস্ত্র বাহিনীকে সশস্ত্র ভাবে প্রতিরোধ করা কখনো উচিত নহে, এইরূপ ধারণা মহাত্মাজী পোষণ করিলেও আমি করি না। ইসলাম ধর্ম যে অবস্থায় এইরূপ বলপ্রয়োগকে সংগত বলিয়া স্বীকার করে, সেরূপ অবস্থায় হিংসার প্রতিরোধে হিংসার ব্যবহার যে বিধাতার বিধিসংগত কার্য, আমি তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কিন্তু, সেই সংগে, বর্তমান আন্দোলন বা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর যুক্তির সহিত

বং আমি তাঁহার সততায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। আমার দৃঢ় তবর্ষ কখনো অস্ত্রের সাহায্যে সফল হইতে পারে না। সুতরাং অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয় হইবে না। ভারতবর্ষ মাত্র অহিংসা আন্দোলনের মধ্য দিয়াই জয়ী হইতে পারে। এবং ভারতের এই জয়লাভ নৈতিক শক্তির জয়লাভের একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে।"

যে-আবুল কালাম একদা কৈশোরে সন্ত্রাসবাদীদের দলে ভিড়েছিলেন, এবং যে আবুল কালাম মহম্মদের রীতিতে পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন, অহিংসায় তাঁর পক্ষে গোঁড়া বিশ্বাসী হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সত্যাগ্রহী আবুল কালামের এই সত্যটুকু সহজে স্বীকার করতে কোনো দ্বিধা হয় নি। কারণ, অহিংসা তাঁর জীবনে বড়ো কথা নয়। তাঁর জীবনে বড়ো কথা— স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, সত্য।

সাত

বহু শীর্ষ-স্থানীয় নেতাকে বন্দী করা সত্ত্বেও দেশব্যাপী জাগরণের এই দুর্দাম বন্যাস্রোতে ব্যাঘাত ঘটলো না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বড় লাট লর্ড রেডীং-এর মারফৎ গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব করলেন। গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনা হোলো কি কি শর্তে কংগ্রেস ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে অপোষ-মীমাংসা সম্ভব। এখানেও বৃটিশের সেই চিরাচরিত ভেদ ও শাসনের নীতি কার্যকরী ছিল। তাই কংগ্রেস যখন আপোষ-মীমাংসার প্রধান না হলেও প্রথম শর্ত অনুসারে খিলাফতী বন্দীদের অচিরে মুক্তির দাবী করলেন, বৃটিশ সরকার তাতে রাজী হলেন না। কংগ্রেস খিলাফৎ আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বৃটিশের সংগে আপোষ-মীমাংসা করুক এবং তার ফলে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এক দুস্তর দুর্নিবার ভেদের সৃষ্টি হোক, এই ছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মতলব। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং অন্যান্য হিন্দু নেতারা বৃটিশের কূট নৈতিক ফাঁদে এতো সহজে পা দিলেন না। তাঁরা ঘোষণা করলেন, অবিলম্বে খিলাফৎ বন্দীদের মুক্তির প্রয়োজন। নতুবা সভা সম্মিলনে বৈঠকে, আলোচনায় কোনো ফল নাই। কিন্তু তাতে বৃটিশের কী লাভ? তাতে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কেবল নিবিড়তর ও দৃঢ়তর হওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। সুতরাং বৃটিশ কর্তৃপক্ষ গররাজী হলেন। কংগ্রেস-ও এই শর্তে ভিন্ন আলাপ-আলোচনায় অগ্রসর হলেন না। ফলে গোল টেবিলের পরিকল্পনা ভেস্তে গেলো ; এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মওলানা আবুল কালাম প্রভৃতি বহু সহস্র বন্দীকে দণ্ডকাল সম্পূর্ণরূপেই কারাগারে কাটাতে হোলো। এবং পরে বৃটিশ সরকার তাঁদের চূড়ান্ত ব্যবস্থারূপে যখন মহাত্মা

গান্ধীকে বন্দী করলেন, তখন সমগ্র অসহযোগ আন্দোলনের স্রোতে ভাটা পড়লো। গান্ধীজি তাঁর বন্দীত্বের প্রাক্কালে দেশের জনসাধারণকে জানালেন যে, তাঁকে গ্রেপ্তার করলে দেশবাসী যেন উত্তেজিত না হন এবং অহিংসা ও সহনশীলতার চরম পরীক্ষায় তাঁরা যেন সহজে উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। তাছাড়া, দেশের নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের রীতি ও রণাংগন পরিবর্তনের প্রয়োজন, একথাও গান্ধীজি দেশবাসীকে বোঝালেন। তিনি দেশবাসীর সম্মুখে যে-নূতন কর্মপন্থা উপস্থিত করলেন, তা হোলো সমগ্র দেশে, গ্রামে—নগরে—সংগঠন মূলক কাজ। কিন্তু, গান্ধীজির এই নূতন কর্মপন্থাকে দেশবাসী গ্রহণ করতে পারলো না। তাদের প্রিয় নেতারা কারাগারে থাকায় সংগ্রামশীল কোনো আন্দোলন চালানোও তাদের পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। ফলে সমস্ত ভারতবর্ষে যে দৃঢ়-সংবদ্ধ একটি ঐক্যানুভব দেখা দিয়েছিল, তাতে স্পষ্ট দেখা দিল শৈথিল্য, ভাঙনের সম্ভাবনা, ব্যর্থতার ক্লান্তি। দেশের যখন এই অবস্থা, তখন চিরদিন যেমন হ'য়ে থাকে—প্রতিক্রিয়াশীলেরা, যারা দেশের সংগ্রামের সময়ে দূরে ছিল, তারা এগিয়ে এলো এবং বৃটিশ শাসন-কর্তৃপক্ষের হাতে 'ভেদ ও শাসনের' যন্ত্ররূপে পরিচালিত হ'তে লাগলো। সেদিন দেশে যে-প্রতিক্রিয়ার বীজ উপ্ত-অংকুরিত হোলো, তার বিষাক্ত ফসল উঠলো ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতবর্ষে—যার মর্মন্তুদ নৃশংস গ্লানির কাহিনী সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসকে লজ্জিত করেছে।

খিলাফতের মিলন প্রতিক্রিয়াশীলদের নিঃশ্বাসে হাওয়ায় উড়ে গেলো। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মুষ্টিমেয় স্বার্থান্বেষী তথাকথিত নেতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ-সিদ্ধির কাজে যন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। বলপ্রয়োগে গো-বধ নিরোধ করতে চাইলো হিন্দুরা। মুসলমানেরা দাবী করলো তাদের মসজিদের আশেপাশে উপাসনার সময়

কোনো বাদ্য-বাজনা চলবে না। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য হ'য়ে উঠলো। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা স্ব স্ব সম্প্রদায়কে বোঝাতে চাইলেন যে তাঁদের ধর্ম সংক্রান্ত এই দাবী সম্পূর্ণ সংগত, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অপরিহার্য প্রথম শর্ত। উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা অন্য ধর্মের জনসাধারণকে আক্রমণ করতে লাগলো। অনেকের ঘটলো বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর। সর্বত্র কি হিন্দু, কি মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ঠদের গৃহ, সম্পত্তি, জীবন বিপন্ন হ'য়ে উঠলো। সংবাদপত্রে, প্রচারপত্রে অতি সাধারণ ঘটনাকেও গুরুতর ভয়ংকর রূপ দেওয়া হ'তে লাগলো।

ভারতে যখন এই দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠছে, তখন একমাত্র যে প্রতিষ্ঠান সেখানে যোগ্য প্রতিরোধশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারতো, তা ছিল কংগ্রেস। কিন্তু ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে আবুল কালাম যখন মুক্তি পেলেন, কারাগারের বাইরে এসে তিনি দেখলেন, কংগ্রেস দ্বিধা-বিভক্ত, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে আত্মঘাতী দ্বন্দ্বে লিপ্ত। গান্ধীজি ১৯২২ খৃস্টাব্দে কারাগারে যাবার পূর্বমুহূর্তে দেশবাসীকে যে-বাণী দিয়ে গিয়েছিলেন, তা সংগঠন-মূলক কর্মের। কংগ্রেসের মধ্যে একদল, যথা শ্রীরাজাগোপালাচারী, সর্দার প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ডক্টর আনসারি প্রভৃতি গান্ধীজির কর্মপন্থাকে বিশ্বস্ততার সংগে অনুসরণ করতে চাইছেন। অন্যপক্ষে পণ্ডিত মতিলাল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বীঠলভাই প্যাটেল, সুভাষ বসু প্রভৃতি ব্যক্তিরা অনুভব করছেন,গঠনমূলক কর্মের দ্বারা রাজনীতিক বিপ্লব অসম্ভব। রাজনীতিক বিপ্লবের জন্যে প্রয়োজন রাজনীতিক সংঘাতের।

পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ নেতারাও অহিংস অসহযোগনীতির অনুগামী ছিলেন। কিন্তু তাঁরা আইন-সভা বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁরা চাইলেন সরকারের সংগে অসহযোগ করতে আইন-সভার মধ্যে থেকে,

সরকারী কাজে বাধা-বিরোধ ঘটিয়ে। এ হোলো তাঁদের মতে নিষ্ক্রিয় অসহযোগ নয়, সক্রিয় অসহযোগ। সুতরাং তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন, কংগ্রেস কর্ম্মীদের দ্বারা আইন-সভাগুলিতে সাধ্য মতো আসন অধিকার করা একান্ত প্রয়োজন এবং এইভাবে অকর্মণ্য করা সরকারের দ্বৈত শাসনের রীতিকে। এইভাবে এই দলের নাম হোলো পরিবর্তনপন্থী বা 'Pro-changers'। এবং গঠনমূলক কার্যের প্রচারক শ্রীরাজাগোপালাচারী ও প্যাটেল প্রমুখ নেতাদের আখ্যা হোলো পরিবর্তনবিরোধী বা 'No-changers.'

পরিবর্তনপন্থী ও পরিবর্তনবিরোধীদের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন মধ্যস্থের মতো আবুল কালাম আজাদ। তিনি ঘোষণা করলেন, পরিবর্তন বিরোধিতা রাজনীতিতে সর্বতোভাবে অচল। অন্যপক্ষে, সকল প্রকার পরিবর্তনই সমর্থন-যোগ্য নয়। দেশের বর্তমান অবস্থায় আবুল কালামের কাছে আশু প্রয়োজনীয় মনে হোলো কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান করা এবং কংগ্রেসকে সর্বপ্রকারে শক্তিমান ক'রে তোলা। মওলানা আজাদ তাই কংগ্রেসী দুই দলের মধ্যে একটি গ্রহণীয় মীমাংসার পরিকল্পনা খুঁজতে লাগলেন। তাঁর ওপর দুই বিরোধী দলেরই বিশ্বাস ছিল প্রচুর। সুতরাং তাঁর পক্ষে এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ উপযুক্ত হোলো।

মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী দল ছিল জমিয়ৎ-উল-উলেমা। তাঁরা প্রথম থেকেই সরকারের সংগে সকল প্রকারের সহযোগিতাকেই ধর্মের দিক থেকে পাপ ব'লে ঘোষণা করেছেন। সুতরাং বর্তমানে কংগ্রেসের আইন-সভায় যোগদানকে তাঁরা কোনো রকমেই সমর্থন করতে পারছেন না—কারণ, ঐ আইন সভাগুলি সরকারের হাতে সৃষ্ট কতোকগুলি শাসনযন্ত্র মাত্র। নিখিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁরা

তাঁদের এই নির্দেশ ঘোষণা করেছেন। সুতরাং আইন-সভায় প্রবেশের জন্যে জমিয়ত-উল-উলেমার সমর্থন পাওয়া ছিল অসম্ভব। অথচ এই সমর্থনের মূল্যও কংগ্রেসের কাছে অল্প ছিল না। জমিয়েত-উল-উলেমা দলের এই নির্দেশ পরিবর্তন করাবার মতো ক্ষমতা কংগ্রেসীদের মধ্যে কেবলমাত্র আবুল কালাম আজাদেরই ছিল। কারণ ভারতবর্ষের সমস্ত দরবেশদের উপর তাঁর যেমন ছিল অক্ষুণ্ণ প্রভাব, দরবেশদেরও মওলানা আবুল কালামের জ্ঞান ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রতি ছিল তেমনি অকুণ্ঠ অকৃপণ বিশ্বাস। আবুল কালাম বন্দী হওয়ার পূর্বে লাহোরে দরবেশদের এক সম্মিলন হয়। সেখানে সমস্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সহস্রাধিক দরবেশ আসেন। তাঁরা সকলেই মওলানা আজাদকে সর্ব ভারতের ইমাম পদে অভিষিক্ত করার প্রস্তাব করেন। এই ইমামের পদ ভারতীয় মুসলমানদের ধর্ম সংক্রান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পদ—কতকটা রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের পোপের মতো। আবুল কালাম কিন্তু এই গৌরব ও সম্মানের পদকে শ্রদ্ধার সংগে প্রত্যাখ্যান করেন। কারামুক্তির পরও আবার তাঁকে ঐ পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তিনি জমিয়ত-উল-উলেমার কার্যকরী সভাকে ধন্যবাদের সংগে জানান, এই গৌরবময় দায়িত্ব গ্রহণ তাঁর রাজনীতিক কার্যের অন্তরায় হ'তে পারে এবং তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকতর ক্ষতির সম্ভাবনা, সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রেই তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের সেবা করতে চান। সেদিন আবুল কালামের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ আবুল কালামকে দরবেশদের কাছে প্রিয়তর ক'রে তুললো। সুতরাং কংগ্রেসের আইন-সভায় প্রবেশের ব্যাপারে আবুল কালাম জমিয়ত-উল-উলেমার সমর্থন লাভ করলেন, যদিও তাঁর ধর্ম সংক্রান্ত জ্ঞান ও অখণ্ডনীয় যুক্তিই এ বিষয়ে তাঁর সহায়তা করলো।

১৯২৩ খৃস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হোলো। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন মওলানা আবুল কালাম স্বয়ং। সভাপতির অভিভাষণে মওলানা সাহেব পরিবর্তন-পন্থী এবং পরিবর্তনবিরোধীদের কিরূপে আপোষ-মীমাংসা সম্ভব, তার বিশদ একটি পরিকল্পনা দিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে স্থির হোলো, কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা আইন সভায় প্রবেশ ক'রে সরকারী দ্বৈত শাসনের কুটিল ব্যবস্থাকে আভ্যন্তরীণ অসহযোগে দ্বারা বানচাল করতে চান, তাঁরা সে-সুযোগ পাবেন এবং অন্য পক্ষে, যাঁরা গান্ধীজির নির্দেশ অনুধায়ী গঠনমূলক কর্মপন্থার অনুসরণ করতে ইচ্ছুক, তাঁরাও তা করতে পারবেন। অর্থাৎ সরকার যেমন-দ্বৈত-শাসনের নীতি অনুসরণ করছে, কংগ্রেসও তার প্রতিরোধে দ্বৈত অসহযোগের নীতি অবলম্বন করবেন। উভয় পক্ষের কাছেই এই আপোষের শর্ত সমান ভাবে গ্রহণীয় হোলো। এই পরিকল্পনা অনুসারে কংগ্রেস তাঁদের পার্লামেণ্টারি কর্মসূচী গ্রহণ করলেন।

এখানে এ কথার উল্লেখের প্রয়োজন, পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে মওলানা সাহেবের যে বিশ্বাস ছিল এমন নয়। এই বিষয়ে তাঁর জীবনীকার মহাদেব দেশাইএর একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,

"আমি জানিতাম, কাউন্সিল-প্রবেশের কর্মসূচী আমাদিগকে অধিক দূর লইয়া যাইতে পারিবে না। কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যতের দিকে। কংগ্রেস কর্মী ও কংগ্রেসী নেতাদের একটি বিশিষ্ট অংশকে পার্লামেণ্টারি মনোবৃত্তিকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাই আমার মনে হইল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোনো সূচী না থাকায় পার্লামেণ্টারি কর্মসূচী কতক পরিমাণে কার্যকরী হইতে পারে।"

যাই হোক, এই কংগ্রেসী দুটি দলের মধ্যে একটি আপোষ মীমাংসা

অত্যাবশ্যক ছিল। কারণ, কংগ্রেসের আত্মক্ষয়ী সংগ্রামের সুযোগে প্রতি-ক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি মাথা তুলে উঠছিল এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ঘনীভূত ক'রে তোলার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করছিল। কংগ্রেস দুর্বল এবং অসংঘবদ্ধ হ'য়ে পড়ায় হিন্দু মহাসভার জন্ম হোলো এবং কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল একটি অংশ এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টির ব্যাপারে প্রত্যক্ষে বা প্রকারান্তরে সাহায্য করতে লাগলো। অন্য-ধর্মীর প্রতি অত্যাচার এবং ধর্মান্তর চলতে লাগলো দেশময়। চলতে লাগলো শুদ্ধি, চলতে লাগলো তাবলিঘ। এমনি ভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমেই ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে লাগলো। এই ব্যাপারে জঘন্যতম প্রচারকার্য চালাতে লাগলো সংবাদপত্রগুলি। প্রকাশিত হ'তে লাগলো নানা প্রকারের উত্তেজক পুস্তিকা, বিদ্বেষ-প্রণোদিত প্রচার-পত্র। দেশের নানা স্থানে দাংগা হাংগামাও বেধে গেলো।

এমনি একটি আবহাওয়ার মধ্যে গান্ধীজি কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। চতুর্দিক থেকে দুঃসংবাদ আসতে লাগলো, মুলতান থেকে, শাহরণপুর থেকে, আগ্রা থেকে, আজমীর থেকে, পালোয়াল থেকে। দাংগা, হাংগামা, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড। মন্দির মসজেদের অপবিত্রকরণ, উচ্ছেদ। হিন্দু সম্প্রদায়ও গান্ধীজিকে অভিযুক্ত করতে লাগলো। 'আপনিই আমাদের খিলাফৎ আন্দোলনে যোগ দিয়ে মুসলমান-দের শক্তিশালী ও সংঘবদ্ধ করার কাজে সাহায্য করতে বলেছিলেন। এখন খিলাফৎ আন্দোলন শেষ হয়েছে। আর তাই সংঘবদ্ধ মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে জেহাদ। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্যে আপনিই দায়ী।'

এমনি ধরণের নানা অভিযোগ অনুযোগ আসতে থাকলো ভারতবর্ষের

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। গান্ধীজি তাঁর একটি সুবিখ্যাত বিবৃতিতে এই সমস্ত অভিযোগের যথোচিত জবাব দিলেন। ঘোষণা করলেন, যদি তিনি ত্রিকালজ্ঞ হ'তেন এবং বর্তমান সাম্প্রদায়িক হাংগামার কথা পূর্ব থেকে জানতেন, তবু খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে তিনি নিজে বিনা দ্বিধায় যেমন অগ্রসর হ'তেন, তেমনি অগ্রসর হওয়ার জন্যে আহ্বান করতেন সমস্ত দেশবাসীকে। কেবল তাই নয়, খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে দেশে যে জাগরণ ঘটেছে, তার সুফলও অপরিমেয় এবং সুদূরপ্রসারী। খিলাফৎ আন্দোলনে যোগদানের জন্যে তিনি অনুতপ্ত নন, গৌরবান্বিত।

"The awakening among the masses was a necessary part of the training. It is a tremendous gain. I would do nothing to put the people to sleep again."

কিন্তু গান্ধীজির এই বিবৃতিতে দেশের দাংগা হাংগামা থামলো না। বরং দেশময় তর্ক-বিতর্ক, দলাদলি ও বাগবিতণ্ডা বেড়েই চললো। সম্ভল, আমেথি এবং কোহাটে ঘটলো কয়েকটা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দুর্ঘটনা। গান্ধীজি আর শান্ত থাকতে পারলেন না। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এই দেশব্যাপী অন্যায় ও হিংসার প্রায়শ্চিত্ত করার মানসে তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনের সংকল্প ঘোষণা করলেন।

"I must do penance. My penance is the prayer of a bleeding heart for forgiveness for sins unwittingly committed."

গান্ধীজির অনশনের সংবাদ সমগ্র দেশময় বিদ্যুৎগতিতে ছড়িয়ে পড়লো। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ ও নেতৃবর্গ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। দিল্লীতে একটি মৈত্রী সম্মিলন আহ্বানের প্রস্তাব হোলো।

এই সম্মিলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরধা হলেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ।

দিল্লী সম্মিলনে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও মৈত্রীর জন্যে প্রস্তাব গৃহীত হোলো যে হিন্দুরা বলপ্রয়োগের দ্বারা গো-হিংসা নিবারণ প্রত্যাশা করতে পারেন না। তা একমাত্র সম্ভব মুসলমান জনসাধারণের সংগে হিন্দু জনসাধারণের মিলন, পারস্পরিক ধর্ম-সহিষ্ণুতা ও শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে। এই প্রস্তাব প্রসংগে হিন্দু "স্বার্থ-রক্ষী"দের পক্ষ থেকে বলা হোলো, তবে আপোষ-চুক্তির মধ্যে একথা স্বীকার করা হোক যে বর্তমানে যে সকল স্থানে গো-বধ হয় না, সে সকল স্থানে মুসলমানেরা গো-বধ করতে পারেন না, এবং মুসলমান জনসাধারণ ধীরে ধীরে গো-বধের পরিমাণ হ্রাস ক'রে অবশেষে গো-বধ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবেন। এই শর্ত, বিশেষত শর্তের শেষোক্তি অংশটি, মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য হোলো না। না হবারই কথা। অথচ গোঁড়া হিন্দু নেতারাও এই শর্তে ভিন্ন কোনো মতেই আপোষে রাজী হলেন না। এমনি ভাবে শান্তি সম্মিলন গোঁড়া সংকীর্ণমনা হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের কুৎসিত দর-কষাকষির বাজারে পরিণত হোলো। শান্তি সম্মিলনকে তার যোগ্য মর্যাদা দিয়ে সেখানে উভয় সম্প্রদায়ের প্রীতি ও মিলনের শুভেচ্ছাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলেন আবুল কালাম আজাদ। তিনি মুসলমানদের জানালেন যে গো-কোরবানি মুসলমানদের ধর্মের কোনো প্রকার অপরিহার্য অংগ নয়। স্নতরাং স্বদেশবাসী অন্য সম্প্রদায়ের স্নবিধার্থে তাঁদের সতর্ক হওয়া উচিত। সেই সংগে তিনি হিন্দু জনসাধারণের উদ্দেশ্যেও বললেন যে, মুসলমানদের মধ্যে গো-মাংস-প্রীতি অত্যন্ত প্রবল নয়। এই সভায় উপস্থিত বহু মুসলমানই গো-মাংস স্পর্শ করেন না। স্নতরাং হিন্দু জনসাধারণ মুসলমানদের সম্প্রীতি ও শুভেচ্ছার ওপর নির্ভর করতে পারেন। শান্তি সম্মিলনে মওলানা

সাহেবের কেবল ক্ষুরধার যুক্তিই উপস্থিত জন নেতাদের বিচলিত করলো না, সেই সংগে তাঁদের অভিভূত করলো তাঁর অতুলনীয় ওজস্বিনী ভাষা। হিন্দুদের পক্ষ থেকে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্মিলনের আপোষ-মীমাংসার শর্তকে গ্রহণীয় ব'লে ঘোষণা করলেন।

গান্ধীজির অনশন-শেষে আবুল কালাম, হাকিম আজমল খাঁ এবং ডক্টর আনসারি প্রভৃতি মুসলিম নেতারা যখন গান্ধীজির সংগে সাক্ষাৎ করতে এলেন, তখন অনশন-ক্লান্ত দুর্বল মহাত্মা তাঁদের বললেন :

"I do not know what is the will of God; but on this day I would beseech you to promise to lay down your lives, if necessary, for the cause (of the Hindu-Muslim unity.)"

আজ ভারতের এই দুর্দিনে, হিন্দু মুসলমানের আত্মঘাতী কলহের ঘনঘোর দুর্যোগে হাকিম আজমল খাঁ নেই, নেই ডক্টর আনসারি। কিন্তু আছেন আবুল কালাম আজাদ। হিন্দু মুসলমানের মিলনকামী বহু নেতাই যখন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কুৎসিত পংকে পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হ'য়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিন্দুমাত্র ধূলিকণাও মওলানা আবুল কালামকে আজো স্পর্শ করে নি। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, সকল ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্রতর হিংসা-দ্বেষের অতীতে ভারতের এক ভাবী স্বপ্নের মতো তিনি বিরাজ করছেন। এই প্রসংগে তুলনীয় হিসাবে সহজেই মনে পড়ে, মুসলিম লীগের বর্তমান নেতা মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নাকে। মনে পড়ে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের সভাপতির আসন থেকে হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক বিরোধ ও বিদ্বেষকে নিন্দিত ক'রে হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর জন্যে তাঁর উদাত্ত আহ্বান, আর তার পর মনে পড়ে ১৯৪০ সালের স্বার্থান্ধ কদর্য

সাম্প্রদায়িকতার নির্লজ্জ বিষোদ্গার। আবুল কালামের দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক জীবনে যেমন বারেকের জন্যে আদর্শ থেকে লক্ষ্য চ্যুতি ঘটে নি, তেমনি ঘটে নি ব্যক্তি স্বার্থের আকর্ষণ-বিকর্ষণে রাজনীতির প্রশস্ত প্রকাশিত রাজপথ থেকে কক্ষচ্যুতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন নিঃস্বার্থ ব্যক্তিত্ব স্বল্পই দেখা যায়।

মিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না ১৯২৫ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। তখনো তিনি হিন্দু মুসলমানের মৈত্রীর 'বাণীবাহক' বলে অভিহিত হতেন। তিনি ঐ সময় তাঁর সভাপতির অভিভাষণে হিন্দু-মুসলমানের মিলনকেই স্বাধীনতার একমাত্র উপায় ব'লে ঘোষণা করেন। হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর জন্যে পুনরায় দিল্লীতে একটি সম্মিলন আহ্বান করা হোলো না। এই সম্মিলনের সভাপতি হ'লেন ডক্টর আনসারি। কিন্তু সভা সমিতি ও আলাপ-আলোচনা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক সন্দেহ দূরীভূত হোলো না। ১৯২৫ খৃস্টাব্দেও পুনরায় ভারতের কয়েক স্থানে সাম্প্রদায়িক দাংগা হাংগামা দেখা দিলো।

এই সময় বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের জন্যে একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রস্তাব উঠলো। বৃটিশ সরকার যাতে এই শাসনতন্ত্রটিকে বাইরে থেকে ভারতবাসীর ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দিতে না পারে 'এবং ভারতবাসীদের সম্মতিক্রমেই এই শাসনতন্ত্রের রচনা ঘটে, সে জন্যে প্রয়োজন হোলো হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যবর্তী বিদ্বেষ ব্যবধানকে দূরীভূত ক'রে তাদের সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধ করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় একটি সর্বদলীয় সম্মিলন আহূত হোলো। এই সম্মিলনের প্রধান কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হ'লেন মিঃ জিন্না। কিন্তু এই সম্মিলনও বিশেষ ফলপ্রসূ হোলো না। আবার বিভিন্ন স্থানে দাংগা হাংগামার

আগুন জ্বলে উঠলো। বাংলা দেশের বরিশাল, ময়মনসিং প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাংগামার সংবাদ আসতে লাগলো। কলিকাতাতে দাংগা বাধলো। দেশের এই দুর্দিনে আবুল কালামের বিন্দুমাত্র বিশ্রাম রইলো না। যদিও তাঁর শান্তি সভাগুলিও প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেলো না।

১৯২৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তখনকার ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন ঘোষণা করলেন যে বৃটিশ সরকার ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংস্কারের জন্যে একটি কমিশন নিয়োগ করেছেন। এই কমিশনের নেতৃত্ব করবেন সার জন সাইমন। কমিশন ভারতে এসে ভারতের জনমত সংগ্রহ ক'রে বেড়াবে এবং অতঃপর তারা এই তথাকথিত জনমত পেশ করবে বৃটিশ পার্লামেন্টের কাছে। আবার বৃটিশ পার্লামেন্ট এই জনমতকে পাঠাবে জয়েণ্ট পার্লামেন্টারি কমিটির জ্ঞাতার্থে। এবং এই জয়েণ্ট পার্লামেন্টারি কমিটি নির্ধারিত করবে কিরূপে ও কি পরিমাণে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র ভারতবর্ষকে দেওয়া চলতে পারে।

বৃটিশ পার্লামেন্টের এই প্রস্তাব ও কমিশন যে সম্পূর্ণ একটি রাজনীতিক চাল, ভারতের জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের তা বুঝতে বিন্দুমাত্রও বাকী রইলো না। কারণ, এই তথাকথিত তদন্তকারী দলে, ভারতীয় জনসাধারণের হিন্দু মুসলমান কোনো প্রতিনিধিকেই গ্রহণ করা হয় নি। ঐ বৎসর মাদ্রাজে নিখিল ভারত কংগ্রেসের যে অধিবেশন হোলো তাতে ডক্টর আনসারি হিন্দু মুসলমানের সমস্ত মতদ্বৈধ দূর ক'রে একযোগে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ঘা দেওয়ার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করলেন। কেবল তাই নয়, কংগ্রেস স্থির করলেন সাইমন কমিশনকে দেশের সর্বত্র বয়কট

করার জন্যে। এই উদ্দেশ্যে দেশের জনমতকে গ'ড়ে তোলার জন্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবে আবুল কালাম ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। তিনি পাঞ্জাবের সর্বত্র পূর্ণ হরতালের ব্যবস্থা করলেন। হরতাল ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে বহুস্থানে পুলিশের হামলা হোলো। লাহোরে দেশবরেণ্য নেতা লালা লজপৎ রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং মারা গেলেন। দেশময় উত্তেজনা ও বিক্ষোভের সীমা রইলো না। দেশের সর্বত্রই সাফল্যের সংগে কমিশনকে বয়কট করা হোলো। লক্ষ্ণৌ-এ-ও পুলিশের কর্মতৎপরতা দেখা গেলো। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ সহ বহু হিন্দু মুসলমান স্বেচ্ছা-সেবক পুলিস কর্তৃক আক্রান্ত এবং আহত হোলেন।

তখনো কংগ্রেসের একটি অংশ পণ্ডিত মতিলালের নেতৃত্বে ভারত সরকারের আইন সভাগুলিতে কাজ করছিলেন। ভারত সরকারের এই বিমূঢ় বর্বরতা তাঁকে বিব্রত ক'রে দিলো। তিনি কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে গভর্ণমেণ্টকে এক বৎসরের মধ্যে ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়ার জন্যে চরম পত্র দিলেন। অন্যথায় কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের জন্যে সংগ্রাম শুরু করতে মনঃস্থ করলো।

বৎসর শেষ হয়ে এলো, কিন্তু বৃটিশ তথা ভারত সরকারের কোনো নীতির পরিবর্তন বা নমনীয়তা দেখা গেলো না। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন-সভা থেকে তাঁদের সদস্যদের পদত্যাগেই নির্দেশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু এর পূর্বে লর্ড আরউইন আর একবার তাঁর কূটনৈতিক চাল চাললেন, ঘোষণা করলেন যে, কখন ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে, সে-সম্বন্ধে ভারতীয় নেতাদের নিয়ে একটি সভা করা হোক। কিন্তু এই ধরণের আলাপ আলোচনায় কোনো ফল হোলো না। তাই পূর্ণ

স্বাধীনতার জন্যে ভারতের যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইলো না।

১৯২৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন। এই অধিবেশনেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ক'রে প্রস্তাব গৃহীত হোলো। কংগ্রেসী সভ্যদের প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় আইন সভাগুলির থেকে পদত্যাগের-ও নির্দেশ এলো।

ভারতের স্বাধীনতা দিবস ব'লে ঘোষিত হোলো ২৬শে জানুয়ারী। ঐ দিন থেকে দেশময় শুরু হোলো পূর্ণ স্বাধীনতালাভের সংকল্প, সংগ্রাম—অখণ্ড অবিরাম প্রস্তুতি।

আট

১৯২৯ খৃস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেই একটি জাতীয় মুসলিম দল গঠিত হোলো। এই দলের সভাপতি হলেন মওলানা আজাদ স্বয়ং। সম্পাদক হলেন টি, এ, শেরোয়ানি এবং কোষাধ্যক্ষ ডাঃ আনসারি। দেশে যে-সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক মুসলিম দল ও প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠছিল সেগুলির প্রতিরোধের জন্যেই এই জাতীয় মুসলিম দলের প্রতিষ্ঠা হোলো। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম দলগুলির দমন ক'রে মুসলমানদের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত সংঘবদ্ধ করার-ও তখন যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। বৃটিশের সংগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আসন্ন। কিন্তু মুসলমান জনসাধারণ এই যুদ্ধ-প্রস্তুতি থেকে অনেক দূরে স'রে গেছে এবং যাচ্ছে-ও। মওলানা মহম্মদ আলি এবং মওলানা সওকত আলি, দুজনেই কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে এসেছিলেন, তাঁরা গান্ধীজিকে সাবধান ক'রে দিলেন যে মুসলমান সম্প্রদায় আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিতে রাজী হবে না। সুতরাং আসন্ন সংগ্রামে মুসলমান জনসাধারণকে অংশ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত করার গুরু দায়িত্ব আবুল কালাম স্বয়ং গ্রহণ করলেন। মুসলমান সম্প্রদায়-ও যে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতোই অকুণ্ঠ চিত্তে ভারতের স্বাধীনতা কামনা করে, এ-বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

এদিকে সংগ্রাম ক্রমেই আসন্ন হয়ে এলো। ভারত তথা বৃটিশ সরকারের মধ্যে কোনো প্রকার নমনীয়তার লক্ষণ দেখা গেল না। বড়লাট কেবল মাত্র লণ্ডনে একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান সম্পর্কে ভরসা দিলেন। এ-রকম বৈঠকী আলাপ আলোচনার উপর ভারতীয়

জনসাধারণ তথা ভারতীয় নেতাদের কারো বিন্দুমাত্র-ও বিশ্বাস ছিল না। তাই এ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এবং মতিলাল নেহরু বড়লাটের সংগে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ভরসাই বড়লাট দিতে পারলেন না। সুতরাং নেতারা বৈঠক এবং আলাপ আলোচনায় অনর্থক কাল-ক্ষয়ের কোনো স্বার্থকতা দেখলেন না। ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে সমস্ত ভারতবর্ষে স্বাধীনতা দিবস প্রতিপালিত হোলো। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে দেশময় উচ্চারিত হোলো স্বাধীনতার সংকল্প-বাক্য। কিন্তু বাক্যের অপেক্ষা কার্য অনেক কঠিনতর ছিল। সংকল্প উদ্‌ঘোষিত হোলো, কিন্তু সংগ্রামের কোনো পন্থা নির্দিষ্ট হোলো না। জওহরলাল নেহরুর ভাষায়ঃ

"The great question that hung in the air now, was —how ? What form of civil disobedience should we take up that would be effective, suited to the circumstances and popular with the masses ?"

১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে গান্ধীজি এই অহিংস অসহযোগ যুদ্ধের নূতন কর্মপন্থা ঘোষণা করলেন। তিনি বড়লাটকে লেখা একটি পত্রে জানালেন, তিনি ১১ই মার্চ তারিখে তাঁর আশ্রমের সহকর্মীদের সংগে একযোগে লবণ আইন অমান্য করবেন। লবণ আইন অমান্য ব্যাপারটি অনেকের কাছে কৌতুকাবহ মনে হ'তে পারে। কিন্তু এর মধ্যে গান্ধীজির রাজনীতিক দৃষ্টির স্পষ্টতম পরিচয় পাওয়া যায়। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ (সমস্ত সাম্রাজ্যবাদই) যে কয়েকটি পুঁজিবাদী বণিকের ষড়যন্ত্র মাত্র, তা একটি মাত্র অংগুলি নির্দেশেই সমস্ত ভারতবর্ষে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেলো। বৃটিশ পুঁজিবাদীদের কারখানায় প্রস্তুত লবণ বিক্রয়ের জন্যে চাই বাজার,

এবং সেই বাজার পরিপূর্ণরূপে পাওয়ার জন্যে চাই ভারতবাসীদের পক্ষে তাদের দেশের মাটি থেকে লবণ প্রস্তত নিষিদ্ধ করা। তাই গান্ধীজির লবন আইন অমান্য যুদ্ধের রীতি অনুসারে কার্যকরী হোক আর নাই হোক, যুদ্ধের প্রকৃত কারণটি নিরাবরণ ক'রে দেওয়ার পক্ষে যে প্রচুর হয়েছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গান্ধীজি বলেন ঃ

"I regard the tax to be the most uniquitious of all from the poor man's stand point. As the Independence Movement is essentially for the poorest in the land the beginning will be made with this evil."

লবণ আইন অমান্যের জন্যে মহাত্মার ডাণ্ডি অভিযান সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। ভারতবর্ষে সৃষ্টি করলো এক তুমুল আলোড়নের। গান্ধীজির অনুসরণ ক'রে দলে দলে লক্ষ লক্ষ নরনারী লবণ আইন অমান্যের জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষে অভিযান করলো। ঘরে ঘরে পবিত্র অনুষ্ঠানের মতো লবণ তৈরী চলতে লাগলো। তাই সরকারী নির্যাতন-ও কঠোর থেকে হ'তে লাগলো কঠোরতর। গান্ধীজি গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু তাতে-ও কোনো প্রকার শৈথিল্য বা দৌর্বল্য দেখা গেল না জনসাধারণের। বিলাতী দ্রব্য বর্জন শুরু হোলো। সরকারী চাকুরেদের চলতে লাগলো সামাজিক বয়কট। ট্যাক্স বন্ধ হোলো। এমনিভাবে সমস্ত দেশে আইন অমান্য আন্দোলন তেজী ঘোড়ার মতো পুরো কদমে এগিয়ে চললো। মুসলমানরা দলে দলে এসে সংগ্রামে যোগ দিলেন। মওলানা আবুল কালাম বাংলা, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রভৃতি মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতে শফর দিয়ে সংগ্রামের জন্যে নিত্য নূতন সৈন্যবাহিনী গ'ড়ে তুলতে লাগলেন। মুসলমানেরা আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন না, এই আতংক

মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'য়ে গেলো। সীমান্ত প্রদেশে পাঠানরা গুলীর সামনে অবহেলায় বুক পেতে দিলো। প্রায় ষাট হাজার নরনারী বালকবৃদ্ধ কারাবরণ করলো। প্রায় চার শত নরনারী হোলো নিহত।

গান্ধীজি এবং মতিলাল নেহরু গ্রেপ্তার হবার পর কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ও যুদ্ধের সৈনাপত্য করার পূর্ণ দায়িত্ব এসে পড়লো আবুল কালামের উপর। আবুল কালাম বিনা দ্বিধায় পরিপূর্ণ সামর্থ্যের সংগে তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকেও নিষ্কৃতি দিল না। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি গ্রেপ্তার হ'লেন। বিচারে তাঁর ছয় মাসের কারাদণ্ড হোলো।

বৃটিশ দমননীতি এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌছলো, যার ফলে অহিংসা অনুশীলনের মতো সহিষ্ণুতা জন সাধারণের আর রইলো না। বাংলা এবং পাঞ্জাবে সন্ত্রাসবাদীরা পিস্তল ও বোমা সহযোগে সরকারী কর্মচারীদের নিধন শুরু করলো। অনেক স্থলে চললো লুণ্ঠন এবং অগ্নিকাণ্ড। দেশ-ব্যাপী এক হিংসাত্মক বিপ্লবের সূচনা দেখা যেতে লাগলো। সুতরাং বৃটিশ সরকার ভয় পেলেন। কিম্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, বড়লাট লর্ড আরউইন, সার তেজ বাহাদুর সপ্রু এবং এম, আর, জয়াকরের মারফৎ গান্ধীজির কাছে সন্ধির প্রস্তাব পেশ করলেন—যদিও কংগ্রেসের কোনো দাবীই তিনি মানতে পারলেন না। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সদস্যকেই জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হোলো। গান্ধীজি এবং আরউইনের মধ্যে দীর্ঘ কয়েক দিন ধ'রে কথাবার্তা চলতে লাগলো। এই আলোচনা মোটেই ফলপ্রসূ হবে না, এমন আতংকও সবার মনে স্থান পেলো। তাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ভবিষ্যৎ আইন অমান্যের কর্মপন্থাও প্রস্তুত করতে লাগলেন। যাই হোক, ৪ঠা মার্চ তারিখে গান্ধীজি এবং লর্ড আরউইন একটি স্থির মীমাংসায় এসে পৌছলেন। আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যা-

হৃত হোলো। ফেডারেশন নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রে একটি দায়িত্বশীল গভর্ণমেণ্ট গঠনের কথা হোলো স্থির। এবং পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ-রূপে চাপা প'ড়ে গেলো। এমনিভাবেই ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের আর এক অধ্যায়ের ঘটলো সাময়িক সমাপ্তি।

গান্ধী-আরউইন আলোচনার ফলে বিলাতে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা হোলো। এই বৈঠক যে সম্পূর্ণরূপে বিফল হবে, কূট-নীতিক বৃটিশরা তা জানতেন। কারণ, তাঁদের উস্‌কানিতে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে একটি গোলযোগের সৃষ্টি হবে, তা পূর্ব থেকেই তাঁদের সাময়িক সন্ধি ও গোল টেবিল বৈঠকের পরিকল্পনায় ছিল অবধারিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের নামে মওলানা মহম্মদ আলি ঘোষণা করলেন যে, মহাত্মাকে মুসলমানেরা তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকার করতে রাজী নয়, অথচ অন্য কোনো প্রতিনিধিও অকংগ্রেসী মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে গোল টেবিলে অংশ গ্রহণ করতে চাইলেন না। সুতরাং গোল টেবিল বৈঠক বৃটিশের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বিফল হোলো। গান্ধীজি বিলাত থেকে শূন্য হাতে দেশে ফিরে এলেন। পুনরায় শুরু হোলো আইন অমান্য আন্দোলন। কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িক বিরতির ফলে তার তেজ ও উদ্দীপনা অপেক্ষাকৃত হারিয়ে ফেলেছিল। যার ফলে ভারত সরকার সেই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সহজে দমন করতে সমর্থ হোলেন। তথাপি আন্দোলন শুরু হবার সপ্তাহ কালের মধ্যে গান্ধীজি ও সর্দার প্যাটেল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে কারারুদ্ধ হোলেন। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিগুলি বেআইনী ঘোষিত হোলো। সমস্ত ভারতবর্ষে লক্ষাধিক নরনারী গ্রেপ্তার হলেন। অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, নির্যাতন ও পীড়নের চাপে ভারতীয়দের স্বাধীনতা-স্পৃহার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা দেশময়

চলতে লাগলো। আবুল কালাম তখন ছিলেন কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি। তিনিও দিল্লীতে গ্রেপ্তার হ'লেন।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দে এই আন্দোলনে হতবল শ্রান্তির ভাব দেখা গেল এবং কঠিন হাতে ভারত সরকার তাকে দমন করতে সমর্থ হোলেন। গান্ধীজি প্রমুখ নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হোলো। এই সময় বৃটিশ সরকার ভারতে 'ভেদ ও শাসনে'র নীতির ন্যায়সংগত পরিণতি হিসাবে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক ভেদ ছাড়া, কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই ভেদ আবিষ্কার করলো ঃ বর্ণ হিন্দু ও তপশীলী হিন্দু। এমনিভাবে এলো বৃটিশের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। যাই হোক, বৃটিশরা ভারতীয় সমাজের একটা গলিত বীভৎস অংশে হাত দিয়ে ফেলেছিল। গান্ধীজি তাঁর সমস্ত দৃষ্টি এই সামাজিক ব্যাধিটির দিকে অচিরে নিয়োগ করলেন। শুরু হোলো 'হরিজন' আন্দোলন।

মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশটি ক্রমেই তেজীয়ান হ'য়ে উঠছিল। তারা পৃথক নির্বাচনের 'শ্লোগান' তুললো। হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক ক্রমেই শিথিল হ'তে হ'তে সেখানে দেখা দিতে লাগলো এক ভয়ংকর ব্যবধান—যে-ব্যবধানের অতলস্ত গিরি-গহ্বর থেকে দেখা দিলো ১৯৪৬-৪৭-এর সমাজধ্বংসী অগ্ন্যুদ্গার। মওলানা আবুল কালামের মনে সেদিনই এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেলো যে বৃটিশরা ভারত ত্যাগ না করলে হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্ভব। কারণ, হিন্দু মুসলমানের গৃহদ্বন্দ্বের পেছনে রয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূট চক্রান্ত। আইন অমান্য আন্দোলনের বিপ্লবী পথ ছেড়ে কংগ্রেস পুনরায় আইন-সভার মসৃণ-মন্থর পথে অগ্রসর হ'তে চাইলো। আবার স্বরাজ পার্টির ঘটলো পুনরুজ্জীবন।

নয়

কংগ্রেস কেমন ক'রে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিলো, কেমন ক'রেই বা ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে নূতন গঠনতন্ত্রকে স্বীকার ক'রে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের জন্যে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে প্রবেশ করলো, তার ইতিহাস যেমন জটিল, তেমনি দীর্ঘ। এই ক্ষীণকায় পুস্তকে সে কাহিনীকে ঠাঁই দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে, কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে যখনই কংগ্রেস গদীতে এসে বসলো, তখনই তাদের সুপরিচালিত করার জন্যে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তরফ থেকে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দে নিযুক্ত হোলো একটি পার্লামেণ্টারি সাব-কমিটি। এই সাব-কমিটি মওলানা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলকে নিয়ে গঠিত হোলো। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি বুরোক্রাসির চক্রান্তেই হোক, নিজেদের আত্মবিরোধী নীতির ফলেই হোক, কিম্বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাঁদের স্বল্পস্থায়ী শাসন কালে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য যে-কিছুই ক'রে উঠতে পারেন নি, তা বলাই বাহুল্য। ঐ সময়ে বিহারে প্রজা ও জমিদারদের মধ্যে স্ব স্ব শ্রেণী-স্বার্থ নিয়ে যে সংঘাত ঘটে, তার তরংগাঘাতে বিহার মন্ত্রীসভা বেশ বিব্রত হ'য়ে পড়েন। কারণ, নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা গদীতে এসে বসলে প্রজাদের দুঃখ ও দারিদ্র্যের লাঘবের জন্যে যারপর নাই চেষ্টা করবেন। কিন্তু কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ জমিদারদের স্বভাবগত সদাশয়তা এবং প্রজাবৎসলতার উপর গভীর বিশ্বাসী থাকায় নির্বাচনী ইস্তাহার ঘোষণার

সময় জমিদারদের সংঘবদ্ধ বিরোধিতার কথা বিন্দুমাত্রও ভাবেন নি। কিম্বা ভাবলেও সে ভাবনাকে প্রশ্রয় দেন নি। কিন্তু এখন কার্যত তাঁরা দেখলেন, প্রজাদের স্থযোগ-স্থবিধার জন্যে কোনোপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাওয়ায় তার প্রবল বিরোধিতা আসতে লাগলো দলবদ্ধ জমিদারদের পক্ষ থেকে। স্থানীয় জমিদারদের অমতে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণও কংগ্রেসের পক্ষে ছিল অসম্ভব। স্থতরাং আদর্শ ও যুক্তির দোহাই দিয়ে স্থানীয় জমিদারদের কতক পরিমাণে স্বার্থত্যাগের জন্যে উদ্বুদ্ধ না ক'রে কংগ্রেসের উপায় ছিল না। স্থতরাং কংগ্রেসের অন্যান্য বহু সংকট-মুহূর্তেও যেমন আবুল কালামের ডাক পড়ে, এবারে এখানেও পড়লো ঠিক তেমনি। কোনো বিজ্ঞান-সম্মত বা স্থচিন্তিত সমাজতন্ত্রী দৃষ্টিভংগী আবুল কালামের মধ্যে গ'ড়ে না উঠলেও তাঁর অকুণ্ঠ মানবিকতা ও জনসাধারণের কল্যাণ-বুদ্ধি তাঁকে সমাজতন্ত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল ক'রে তুলেছিল। তাই কংগ্রেসের রাজনীতিগত অবস্থা ও সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি ক'রে তিনি জমিদারদের সংগে আলাপ-আলোচনার জন্যে অগ্রসর হলেন। তিনি প্রথমে বোঝাতে চাইলেন, দরিদ্র প্রজাদের যে বেঁচে থাকার মতো সংগতিলাভের ন্যায়সংগত অধিকার আছে, সে কথা। যখন জমিরারেরা এই ব্যাপারটিকে ন্যায়সংগত ব'লে স্বীকার ক'রে নিলো, তখন তিনি তাদের বোঝাতে চাইলেন যে ঃ স্থতরাং, প্রজাদের খাজনা দেওয়ার অসামর্থ্যের জন্যে তার সম্পত্তির—যার মূল্য খাজনার চেয়ে বহু গুণ বেশি তা বিক্রি করার অন্যায় অধিকারকে বহাল রাখার জন্যে জমিদারদের যুক্তিহীন জেদ করা শোভনীয় নয়। জমিদারদের অনমনীয়তার ফলে আপোষ-আলোচনা বিফল হবে মনে হোলো। আলাপ-আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন-সভা মুলতুবি রাখা হোলো। কিছুদিনের মধ্যেই একটা আপোষ-মীমাংসা

সম্ভব হোলো। প্রজাদের দুঃখ দারিদ্র্যের কতোখানি লাঘব হোলো, তা বিহারের কৃষক অধিবাসীরাই বলতে পারেন, তবে মওলানা সাহেবের নিপুণ মধ্যস্থতায় কংগ্রেস যে একটা জটিল অবস্থার হাত থেকে অব্যাহতি পেলো, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এমনি সময় পৃথিবীর পশ্চিম দিগবলয়ে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিলো। অকস্মাৎ মোহমুক্ত ভারতবর্ষ ফিরে এলো তার আপন সম্বিতে। ভোয়া প্রাদেশিক স্বয়ত্ব-শাসনের খেলনা হাতে পেয়ে তারা ভেবেছিল, স্বাধীনতার প্রথম সর্গ উত্তরণ করেছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা মুক্তহস্ত হয়েছে, স্বাধীনতা তাদের করায়ত্ত হোলো ব'লে! কিন্তু পশ্চিমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাধবার সংগে সংগেই তারা উপলব্ধি করলো, তারা গত দুই বৎসর ধ'রে কেবল মাত্র শাসনকর্তার অভিনয় করেছে, তাদের অভিনয়ের সাজঘরটা রয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়রথ-যাত্রার ঘোড়াগুলোর আস্তাবলের ঠিক পাশেই। এই তথাকথিত স্বায়ত্তশাসকদের মৌখিক জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত না ক'রেই ভারতীয় সেনা প্রেরিত হোলো ভারতের বাইরে, মিশরে, সিংগাপুরে। তাঁদের বিনা অনুমতিতেই ভারতবর্ষকে ঘোষণা করা হোলো যুদ্ধরত দেশ ব'লে। ভারত শাসন আইনের ঘটলো সংশোধন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের প্রাত্যহিক শাসন ব্যাপারেও হস্তক্ষেপের অধিকারী হ'লেন। অর্ডিন্যান্স রাজত্বের হোলো শুরু। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ ব্যাপারে অসহযোগিতার নীতি ঘোষণা করতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে এই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ধৈর্য সহকারে কংগ্রেস বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাদের সাম্রাজ্যবাদ ও গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁদের যুদ্ধনীতি কি এবং সে নীতি কি ভাবে ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য হবে তা স্পষ্ট ঘোষণা

করতে অনুরোধ করলেন, যাতে এই যুদ্ধে ভারতবাসীর পক্ষে নিঃসংশয়ে যোগদান সম্ভব হ'য়ে ওঠে। গান্ধীজি অবশ্য বিনা শর্তে বৃটিশকে সাহায্য করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজির এই উপদেশ গ্রহণ করতে পারলেন না। মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সভাপতির অভিভাষণে বললেন :

"আজ যুদ্ধের শোণিত-স্রোতে এবং অগ্নি শিখায় জাতির পর জাতি আত্মনিমজ্জন করিতে ধাইয়া চলিয়াছে। এই মৃত্যু ও ধ্বংসের বন্যাস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার পূর্বে আমরা কি বারেকের জন্যে প্রশ্ন করিব না, কেন এই ধাবন, কেন এই আত্ম বিসর্জন, ইহা কিভাবে আমাদের ভবিতব্যকে প্রভাবিত করিবে ? সকল যুক্তি ও বাস্তব দৃষ্টিভংগীর নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লওয়াই কি আমাদের পক্ষে হইবে উচিত এবং যুক্তিযুক্ত ?"

বৃটিশ কিন্তু তাদের যুদ্ধনীতি ঘোষণা করলো না। ফলে কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি ত্যাগ করলেন, ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখে।

বিগত কয়েক বৎসরে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে কংগ্রেসের গণ্ডী ছাড়িয়ে দূর থেকে আরো দূরে স'রে আসছিল এবং ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল দুস্তর এক ব্যবধান, আবুল কালামের বিরাট ব্যক্তিত্বের সেতু-ও সে ব্যবধানের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাতে সমর্থ হোলো না। কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রি-সভাগুলি পদত্যাগ করায় মিঃ জিন্না ভারতীয় মুসলমানদের সমগ্র দেশে "নিষ্কৃতি দিবস" প্রতিপালনের ফতোয়া দিলেন। কেবল তাই নয়, তিনি প্রচার করতে লাগলেন যে কংগ্রেস শাসনে—অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসনে ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থ-রক্ষার কোনো সম্ভাবনা নাই, তাঁদের স্বার্থ, সংস্কৃতি ঐতিহ্য সমস্তই ভয়াবহ-রূপে বিপন্ন। এই 'পাশবিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার' হাত থেকে অব্যাহতি পেতে

হ'লে চাই ভারতের দ্বিধা বিভক্তি এবং স্বাধীন মুসলিম ভারতের প্রতিষ্ঠা। আবুল কালাম মিঃ জিন্নার এই ভিত্তিহীন অভিযোগের একটি সুন্দর ও সুদীর্ঘ জবাব দেন।

১৯৪০ খৃস্টাব্দে তিনি যখন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন, তখন মওলানা আজাদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের প্রগাঢ় প্রীতির পরিচয় আবার পাওয়া গেলো। অবশ্য মওলানা আজাদের এই জনপ্রিয়তাকে,—হিন্দুমুসলমানের মিলনের জীবন্ত প্রতীককে—মিঃ জিন্না তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল অনুচরদের কাছে বিকৃত ক'রে প্রচার করতে লাগলেন। তিনি মওলানাকে অভিহিত করলেন, স্বজাতিদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক এবং 'শো-বয় অব দি কংগ্রেস' ব'লে। মওলানা সাহেব রামগড় কংগ্রেসে যে সভাপতির অভিভাষণ দেন, তা একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা। তাতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক ফাশীবাদ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতিটি বিশদ ও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। চৈত্রের অবিরাম ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও হাজার হাজার নরনারীর সমাবেশে রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশন হোলো। এই অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হোলো, তাতে ভারত নিজেকে যুদ্ধরত নয় ব'লেই ঘোষণা করলো। কারণ:

"Great Britain is carrying on the war fundamentally for imperjalist ends and for the preservation and Hrengthening of her Empire, which is based on the exploitation of the people of India, as well as other Asiatic and African countries."

(রামগড় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাব, মার্চ, ১৯৪০)

এই প্রস্তাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার সমাধানের জন্যে একটি Consti-